Scanned By:

RONY(Shaibal)
shaibalrony@yahoo.com
01914882384

বিবর্ণ তুষার

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

Thanks To:
Banglabook.com
Rony
shaibalrony@yahoo.com
01914882384

বিবর্ণ তুষার

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

(এই বইয়ের সমস্ত চরিত্র কাল্পনিক)

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩
দ্বিতীয় মুদ্রণ : এপ্রিল ১৯৯৭
তৃতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি ১৯৯৯
চতুর্থ মুদ্রণ : জুন ২০০২

Thanks to Banglabook & Shohel Kazi
RONY
shaibalrony@yahoo.com
01914882384

উৎসর্গ

আলী হায়দার খান
মোহম্মদ শহীদুল্লাহ ও
আব্দুর রাজ্জাক স্বপন
প্রীতিভাজনেষু

এই লেখকের :

একজন দুর্বল মানুষ
আকাশ বাড়িয়ে দাও
দেশের বাইরে দেশ
ছেলেমানুষী
ক্রুগো

Rony
shaibalrony@yahoo.com
01914882384

১

টেবিলের তলা থেকে খুব ধীরে ধীরে একটা তেলাপোকা বের হয়ে এল। মাঝরাতে পানি খেতে ওঠার সময় রান্নাঘরে মাঝে মাঝে যে-অর্ধস্বচ্ছ ছোট তেলাপোকা দ্রুত পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে, এটা মোটেও সেরকম নয়। এটা মোটা এবং বড়। গায়ের রং গাঢ় বাদামী, প্রায় কালচের কাছাকাছি। লম্বা শুঁড় এবং বড় বড় চোখ। একেবারে দেশের তেলাপোকা। দেশে স্টোর-রুমে চালের টিনের পিছনে যে তেলাপোকা লুকিয়ে থাকে এবং বাদলা দিনে হঠাৎ করে একটি দু'টি ক্ষেপে গিয়ে অন্ধকার থেকে বের হয়ে এসে বসার ঘরে উড়তে শুরু করে, মেয়েমহলে আতঙ্ক জাগিয়ে দেয়—এটি সেই তেলাপোকা। তারিক অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, লস এঞ্জেলসে এই তেলাপোকা কোথা থেকে এল? যদি এসেই থাকে, কারো রান্নাঘরের কোণায় না গিয়ে এই ল্যাবরেটরিতে কেন?

তারিক হাতের প্রোবটি টেবিলে রেখে উবু হয়ে তেলাপোকাটির দিকে তাকাল। এটি দেশের তেলাপোকার মতো বড় হতে পারে, কিন্তু সেরকম চালাক-চতুর মনে হচ্ছে না। ভাবভঙ্গি খানিকটা নির্জীবের মতো। টেবিলের তলা থেকে বের হতে গিয়ে মনে হয় সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে ফেলেছে, খানিকটা দম নিয়ে আবার এগিয়ে যাবে। তারিক পা দিয়ে একটু শব্দ করল, তেলাপোকাটি অলসভাবে একটু শুঁড় নেড়ে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করল বলে মনে হল, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। দেশের তেলাপোকা হলে এতক্ষণে হাওয়া হয়ে যেত।

তারিক খানিকক্ষণ তেলাপোকাটি লক্ষ করে সাবধানে শুঁড় ধরে ঝুলিয়ে তোলার চেষ্টা করল। সাপ, জোঁক কিংবা যে-কোনো লম্বা এবং পিছল জিনিস দেখলে তার কেমন জানি গা ঘুলিয়ে আসে, কিন্তু পোকামাকড়ে তার বেশি ঘেন্না নেই।

তেলাপোকাটি এত সহজে তাকে তার শুঁড় ধরে টেনে তুলতে দেবে, তারিক সেটা মোটেও আশা করে নি। শুঁড়টা সরিয়ে নেবার একটা দুর্বল চেষ্টা করে কেমন জানি হাল ছেড়ে দিল। তারিক তেলাপোকাটি চোখের কাছে এনে দেখে, কে জানে হয়তো এটি বৃদ্ধ তেলাপোকা কিংবা কে জানে হয়তো এটা অসুস্থ। কে জানে হয়তো এটা শোকাহত, কীটপতঙ্গের বুদ্ধিবৃত্তি নিশ্চয়ই নিচুস্তরের, কিন্তু মানুষ আর কতটুকু জানে?

তারিক তেলাপোকাটি মেঝেতে নামিয়ে রাখতে যাচ্ছিল, ঠিক তখন দরজা খুলে শ্যারন এসে ঢুকল। শ্যারনের বয়স বাইশ থেকে পঁচিশের ভিতর। অঙ্কশাস্ত্রে পিএইচ.ডি. করতে গিয়ে মাঝখানে ছেড়েছুড়ে তারিকদের দলে এসে ভিড়েছে। শ্যারন অসম্ভব সুন্দরী মেয়ে এবং শুধুমাত্র সে-কারণে তাকে নিতে প্রফেসর বিল ইয়ং কোনো আপত্তি

www.banglabook.com

করেন নি, এ ধরনের একটা কথা শোনা যায়। তারিকের ধারণা, কথাটিতে খানিকটা সত্যতা রয়েছে। ল্যাবরেটরির কাজে শ্যারনের একেবারে কোনো রকম ধারণা নেই, তারিক তাকে কাজকর্ম শেখায়। বেশ শখ করেই শেখায়, এত সুন্দরী মেয়ে— প্রত্যেকবার চোখ ফেরাতেই তার বুকে রক্ত ছলাৎ করে ওঠে।

শ্যারনকে দেখে তারিক তেলাপোকাটি উঁচু করে ধরল। বলল, দেখ কী পেয়েছি!

কী? শ্যারন কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে আসে।

এই দেখ। বেশি নড়াচড়া করছে না। মনে হয় হার্ট অ্যাটাক হয়েছে।

শ্যারন কাছে এগিয়ে আসে। দেশের একটি মেয়ে হলে এতক্ষণে চেঁচামেচি হৈচৈ করে একটা কেলেঙ্কারি করে ফেলত। সবার যে সবকিছু ভালো লাগতে হবে সেরকম কোনো আইন নেই, কিন্তু সেটা নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করতে হবে সেরকমও তো কোনো কথা নেই। শ্যারন মুগ্ধ চোখে হাত বাড়িয়ে বলল, কী এটা?

তেলাপোকা।

এর পর যে-ব্যাপারটি ঘটল, তারিক তার জন্যে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। শ্যারন গলা ফাটিয়ে একটা চিৎকার করে এক লাফে পিছিয়ে গেল। একটা কার্টে ধাক্কা খেয়ে সে ভয়ংকর আরেকটা চিৎকার করে পাশের টেবিলের উপর লাফিয়ে উঠে গেল। টেবিলের উপর থেকে কিছু জিনিসপত্র গড়িয়ে পড়ল নিচে, জাইলীনের একটা বোতল ভেঙে ঝাঁঝালো গন্ধে পুরো ল্যাবরেটরি ভরে গেল সাথে সাথে। শ্যারন দুই হাত সামনে তুলে অদৃশ্য কিছু একটা ঠেলে দেয়ার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থেকে চিৎকার করতে থাকে। দেখে মনে হয় এখনই জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবে।

তারিক এত হকচকিয়ে গেল যে বলার নয়। যখন পাশের ল্যাবরেটরি থেকে জন এবং জিম, সামনের অফিস থেকে প্রফেসর বিল ইয়াং, সেক্রেটারি সারা, ইঞ্জিনিয়ার রিচার্ড এবং চিঠি দিতে আসা কালো মেয়েটি প্রায় ছুটতে ছুটতে ল্যাবরেটরিতে হাজির হয়েছে, তখনো তারিক তেলাপোকাটি শুঁড় ধরে ঝুলিয়ে রেখেছে।

কী হয়েছে? প্রফেসর বিল ভয়-পাওয়া গলায় প্রশ্নটি করেই বুঝতে পারলেন, যা-ই ঘটে থাকুক, সেটা কোনো দুর্ঘটনা নয়। মুখ থেকে আতঙ্কের ছায়াটি সরে গিয়ে কৌতূহল ফুটে উঠল।

তারিক অপ্রস্তুতের মতো তেলাপোকাটি দেখিয়ে বলল, শ্যারন যে এত ভয় পাবে বুঝতে পারি নি!

জন শ্যারনের মতোই আরেকজন ছাত্র। কথা বলার ধরন খুব খারাপ। এবারে হোঃ হোঃ করে শব্দ করে হেসে বলল, তাই বল! আমরা ভাবলাম, তুমি শ্যারনকে রেপ করার চেষ্টা করছ!

প্রফেসর বিল কথাটা না শোনার ভান করে শ্যারনের দিকে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন, বললেন, এত ভয় পাওয়ার কী আছে শ্যারন? একটা পোকা ছাড়া তো আর কিছু না।

শ্যারন প্রফেসর বিলের হাত ধরে সাবধানে টেবিল থেকে নেমে এল, তখনো সে

কাঁপছে। তারিক বলল, আমি খুব দুঃখিত শ্যারন। তুমি এত ভয় পাবে জানলে—

ফেলে দাও প্লীজ। ফেলে দাও—

তারিক অপ্রস্তুতের মতো তেলাপোকাটি ছেড়ে দিল, সেটি মেঝেতে উল্টো হয়ে পড়ে ইতস্তত পা নাড়তে থাকে। সোজা হয়ে পালিয়ে যাবার কোনো চেষ্টাই করে না। দেশের তেলাপোকার তুলনায় এটি দুগ্ধপোষ্য শিশু।

শ্যারন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, মেরে ফেল—মেরে ফেল প্লীজ!

কমবয়সী সুন্দরী একটা মেয়ের এরকম কাতর একটা আহ্বান কেউ ফেলে দিতে পারে না। সব কয়জন পুরুষমানুষ এবারে একসাথে এগিয়ে আসে। প্রফেসর বিল বললেন, ফ্লাস্কে করে একটু লিকুইড নাইট্রোজেন এনে ঢেলে দাও। একেবারে জমে যাবে।

ইঞ্জিনিয়ার রিচার্ড বলল, উঁহুঁ। এই প্রজাতি খুব শক্ত। উপরে ঢাললে হবে না। ফ্লাস্কের ভিতরে এটাকে ছেড়ে দিতে হবে। ডাইনোসরের আমল থেকে আছে এরা।

জিম তারিকের মতো একজন রিসার্চ ফেলো, বলল, একটা কেমিক্যাল আছে, যেটা তেলাপোকার নার্ভাস সিস্টেমকে অ্যাটাক করে, নামটা ভুলে গেছি। কেমিস্ট্রি ল্যাবে দেখেছিলাম, গিয়ে নিয়ে আসব?

জন, যার কথাবার্তা ভাবভঙ্গি চালচলন সবকিছুতে বেপরোয়া উদ্ধত প্রায়, অশোভন একটা ভাব, এগিয়ে এসে বলল, তেলাপোকা কীভাবে মারতে হয় এখনো জান না, এই দেখ—

সে তার পা দিয়ে সশব্দে তেলাপোকাটি মেরে একেবারে মেঝেতে পিষে ফেলল।

প্রফেসর বিল প্রায় একটা আহত দৃষ্টিতে জনের দিকে তাকিয়ে একটা কথা না বলে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। শ্যারনের মুখ দেখে মনে হল সে একটা বাচ্চা প্রসব করার চেষ্টা করছে, অন্য সবাই কমবেশি একটা আর্তচিৎকারের মতো শব্দ করল।

জন তার জুতোর তলা থেকে লেপটে থাকা তেলাপোকার দেহাবশেষ খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পরিষ্কার করার সময় একে একে সবাই ঘর থেকে বিদায় নিল, দৃশ্যটি অস্বস্তিকর। তারিক জনের জুতোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, তুমি ইচ্ছে করে এরকম কর, তাই না?

কী রকম করি?

এই যে তেলাপোকাটাকে এইভাবে পিষে ফেললে?

তাহলে কি আচার বানিয়ে রাখব?

না, আচার বানাতে হবে না। কিন্তু এত বড় একটা তেলাপোকা সবার সামনে চ্যাটকা বানিয়ে ফেললে, দেখে ঘেন্না লাগে না? তোমারও নিশ্চয়ই লাগে, কিন্তু অন্যদের যন্ত্রণা দেয়ার জন্যে তুমি এটা কর। ঠিক না?

জন দাঁত বের করে হাসল। বলল, ঠিক। ন্যাকামো দেখলে আমার একেবারে গা জ্বলে যায়। কথাবার্তার ধরন দেখ সবার, এক তেলাপোকা নিয়ে কত রকম গবেষণা!

www.banglabook.com

গুহ্যদ্বারে যখন ইয়ে করে তখনো কি এরকম গবেষণা করে? এদিক দিয়ে করব, না ওদিক দিয়ে—

জন কুৎসিত একটা ভঙ্গি করে বিশ্রীভাবে হাসতে থাকে।

ছেলেটার ভিতরে ভালো লাগার কিছু নেই। রুক্ষ চেহারা, উঁচু কপাল, হলুদ চুল, ধূসর চোখ, উঁচু চোয়াল, ময়লা দাঁত। অগোছালো জামাকাপড়, কথাবার্তা চালচলনে একটা উদ্ধত অশোভন ভঙ্গি। জগৎ-সংসারের সবকিছুতেই তার কেমন একটা তাচ্ছিল্যের ভাব। তবুও কোনো-একটা কারণে তারিক ছেলেটাকে পছন্দ করে। কারণটা কী কে জানে! সভ্যসমাজে থাকার জন্যে সবাইকে একটা সূক্ষ্ম অভিনয় করে যেতে হয়। পদে পদে ভালো লাগার, খুশি হওয়ার, কৃতজ্ঞ হওয়ার একটা ভান করে যেতে হয়। জন কখনোই করে না, সে কারণেই কি?

জুতোর তলা থেকে তেলাপোকার শেষ অংশটি পরিষ্কার করে জন বলল, টাড়েক—

শব্দটি তারিক। টাড়েক না।

তাই তো বললাম, টাড়েক।

তোমার কাছে তারিক আর টাড়েক একরকম শোনায়?

একরকম নয়?

তারিক হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, ঠিক আছে বল, কী বলবে।

আমি একটা পেপার লিখেছি, তুমি ইংরেজিটা দেখে দেবে?

তারিক উত্তর দেবার আগেই টেলিফোন বাজল, বেশ অনেক কয়জনের টেলিফোন এই ল্যাবরেটরির সাথে জুড়ে দেয়া আছে। তারিক মাথা ঘুরিয়ে দেখল, সবচেয়ে উপরের বাতিটি জ্বলছে, যার অর্থ টেলিফোনটা তার। সে জনকে বলল, এক সেকেন্ড দাঁড়াও।

টেলিফোন করেছেন আমজাদ সাহেব, এখানকার বয়স্ক মানুষজনের একজন। দেশ হলে তারিক চাচা বলে ডাকত, এখানে ভাই বলে ডাকে। তারিক বলল, আমজাদ ভাই, কী খবর?

আমার আর কী খবর হবে! তোমরা কি আর কখনো খোঁজখবর নেবে আমার—

আমজাদ সাহেব তার কাঁদুনি গাইতে শুরু করলেন। ভদ্রলোককে সুযোগ দেয়া হলেই দীর্ঘসময় ধরে নানা রকম কাঁদুনি গাইতে থাকেন। তাঁকে কেউ দেখতে পারে না, কেউ তাঁকে পছন্দ করে না, সবাই তাঁকে এড়িয়ে চলে—এই ধরনের কথা বলায় তিনি বিমলানন্দ পান। তারিক ধৈর্য ধরে বসে রইল, শুধু কাঁদুনি গাইবার জন্যে তিনি ফোন করেন নি, নিশ্চয়ই অন্য কারণও আছে।

কারণটা একটু পরেই বললেন, আজ রাতে তারিক যদি ব্যস্ত না থাকে, সে তার বাসায় খেতে যেতে পারবে কি না।

তারিক খুব যত্ন নিয়ে এই ধরনের চরিত্রদের এড়িয়ে চলে। বিদেশে বাঙালিদের

মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এক ভাগের সব সময় দেশের জন্যে মন কেমন কেমন করতে থাকে, মোটামুটি নূতন প্রেমের মতো দেশের জন্যে একটা ভালবাসার জন্ম হয়। অন্য ভাগের দেশের জন্যে একটা আশ্চর্যরকম হৃদয়হীন বিতৃষ্ণার জন্ম হয়। আমজাদ সাহেব দ্বিতীয় দলের লোক। তাঁর সাথে দেখা হলে তিনি নিজের কাঁদুনি শেষ করেই দেশ এবং দেশের মানুষকে গালিগালাজ শুরু করেন। দেশ সম্পর্কে ভয়ংকর সব গল্প সব সময়েই তাঁর কাছে মজুত থাকে, তাঁর সাথে দেখা হলেই তিনি সেইসব গল্প একটার পর আরেকটা আশ্চর্য উৎসাহ নিয়ে ছাড়তে থাকেন। আমজাদ সাহেবের বাসায় নেহাত বাধ্য না হলে তারিক কখনো যায় না। আজকেও সে খুব সহজেই 'ব্যস্ত আছি' বলে না করে দিতে পারত। এত অল্প সময়ের নোটিশে যেতে না পারা বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু তারিক না করল না, খাবারের আমন্ত্রণটুকু গ্রহণ করে ফেলল। আমজাদ সাহেবের স্ত্রী অত্যন্ত ভালো রান্না করেন। তারিক দীর্ঘদিন থেকে ডিম সেদ্ধ খেয়ে মোটামুটি বুভুক্ষু হয়ে আছে, সেটা একটা কারণ। বাসায় আরো কিছু লোকজন আসবে, তাদের সাথে খাঁটি বাঙালি কায়দায় আড্ডা জমতে পারে, সেটা দ্বিতীয় কারণ। দেশ থেকে আমজাদ সাহেবের একজন সুন্দরী শ্যালিকা এসেছে, সেটা তৃতীয় এবং প্রধান কারণ। মেয়েদের প্রতি তারিকের খানিকটা দুর্বলতা আছে। তার বয়স পঁচিশ, এর মাঝে কখনোই তার কোনো মেয়ের সাথে অন্তরঙ্গতা হয় নি। চমৎকার একটি মেয়ের সাথে ভালবাসার কথা বলার জন্যে মাঝে মাঝেই তার বুক হা-হা করে। ব্যাপারটি কীভাবে ঘটতে পারে তার জানা নেই, সজ্ঞানে কখনো তার চেষ্টা করে নি, কিন্তু সব সময়েই মেয়েদের প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করেছে।

টেলিফোন রেখে ফিরে আসতেই জন বলল, তোমরা অনেক তাড়াতাড়ি কথা বল।

তুমি কেমন করে জান?

শুনলাম।

যে ভাষা বোঝ না সেটা শুনে তুমি কী বুঝবে?

তা ঠিক। তুমি তো ইংরেজিটাও ভালো জান, উচ্চারণটা হাস্যকর, কিন্তু লেখ ভালো। আমার পেপারটা দেখে দেবে তো? টেকনিক্যাল জিনিসটা লাগবে না, শুধু ইংরেজিটা।

তারিক উত্তর দেবার আগেই শ্যারন এসে ঢুকল। মুখে-চোখে ভয়ের ভাবটা আর নেই, বরং একটু অপ্রস্তুত লজ্জার ভাব। তাকে দেখেই জন দুলে দুলে হাসতে শুরু করে। শ্যারন জিজ্ঞেস করল, তুমি এরকম বাজেভাবে হাসছ কেন?

সাহসী মানুষ দেখলে আমার এত আনন্দ হয় যে, হাসি থামাতে পারি না।

যন্ত্রাণা করো না জন, তোমার চেহারা দেখলেই মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। শ্যারন তারিকের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি খুব দুঃখিত ওরকম একটা নাটক করার জন্যে। তেলাপোকা আমার ভীষণ খারাপ লাগে। ছোট তেলাপোকা দেখলেই আমার গা কেমন করতে থাকে, আর এত বড় তেলাপোকার কথা তো ছেড়েই দাও।

জন বাধা দিয়ে বলল, আসলে কী হয়েছে জান?

www.banglabook.com

কী?

তোমার কোনো পূর্বপুরুষকে অতিকায় তেলাপোকা কামড়ে কামড়ে খেয়ে ফেলেছিল। সেই ঘটনা তোমার রক্তের মাঝে, তোমার জিন্সের মাঝে রয়ে গেছে। বংশ পরম্পরায়—

ঢং করো না জন। তুমি বড় বাজে কথা বল!

জন উঠে দাঁড়াল, বলল, আমি গেলাম টাড়েক। তুমি পেপারটার ইংরেজিটা দেখে দেবে তো?

দেব।

শ্যারন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কিসের ইংরেজি?

আমার পেপারটার।

তোমার জন্ম এখানে, বড় হয়েছ এখানে, আর তোমার পেপারের ইংরেজি দেখে দেবে তারিক? একজন বিদেশি মানুষ? যার মাতৃভাষা হিন্দি?

তারিক বাধা দিয়ে বলল, হিন্দি নয়, বাংলা।

যার মাতৃভাষা বাংলা?

জন মুখে একটা হাসি এনে বলল, তোমার লজ্জা করে না তারিকের কাছে পদার্থবিজ্ঞান শিখতে? যার জন্ম হয়েছে বাংলাদেশে—বড় হয়েছে বাংলাদেশে? যে-দেশের মানুষ ছয় মাস খায়, বাকি ছয় মাস খাইখাই করে?

জন শব্দ করে হাসতে শুরু করে। তারিক স্থির দৃষ্টিতে জনের চোখের দিকে তাকাল। সে-চোখে কোনো বিদ্রূপ নেই, কোনো ঘৃণা নেই, অবজ্ঞা নেই, কোনো বিদ্বেষ নেই, শুধু কৌতুক।

শুধু কৌতুক।

২

ঠিকানা মিলিয়ে শ্যারন তার গাড়ি থামাল। তারিক বলল, অনেক ধন্যবাদ শ্যারন। তুমি আমার অনেক ঝামেলা বাঁচিয়ে দিলে।

কোনো সমস্যা নেই। তোমাকে বাসায় সত্যি কেউ পৌঁছে দেবে তো?

হ্যাঁ। সেটা নিয়ে চিন্তা করো না।

সন্ধেটা উপভোগ কর।

করব। কাল দেখা হবে।

শ্যারন হাত নেড়ে গাড়ি ঘুরিয়ে চলে গেল। গাড়িটি কী সুন্দর! শুধু যে সুন্দর তাই নয়, রেখেছেও কত সুন্দর করে! তারিকের জন্যে গাড়ি হচ্ছে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার একটা মাধ্যম। শ্যারন এবং সম্ভবত সব আমেরিকানদের জন্যেই

গাড়ি হচ্ছে একজন সঙ্গী। সারাক্ষণ সাথে সাথে থাকবে, কাজেই তাকে যত সুন্দর করে রাখা যায়, যত ভালো করে রাখা যায়!

তারিক দরজায় হাত দেয়ার আগেই আমজাদ সাহেব দরজা খুলে দিলেন, ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, মেয়েটা কে?

তারিকের এক সেকেন্ড লাগল প্রশ্নটা বুঝতে—শ্যারনের কথা জিজ্ঞেস করছেন। বলল, আমাদের গ্রুপের একজন ছাত্রী। গাড়ি নিয়ে যাই নি বলে নামিয়ে দিয়ে গেল।

ও—ও! আমজাদ সাহেব তবু তীক্ষ্ণ চোখে তারিকের দিকে তাকিয়ে রইলেন, যেন তারিক কিছু-একটা গোপন করার চেষ্টা করছে এবং তিনি তার চোখের দিকে তাকিয়ে সেটা বের করে ফেলবেন।

গার্লফ্রেন্ড? আমজাদ সাহেব গলা নামিয়ে বললেন, লদকালদকি?

মেয়েদের, বিশেষ করে সুন্দরী মেয়েদের নিয়ে তারিককে কেউ যদি ঠাট্টা করে, তারিকের ভালোই লাগে। কিন্তু আমজাদ সাহেবের ভঙ্গিটা বাড়াবাড়ি রকম নোংরা, তারিকের একটু বিরক্তি লেগে গেল। বলল, না আমজাদ ভাই, আপনি যেসব ভাবছেন সেসব কিছু না।

ভালো, তা হলেই ভালো। তারপর গলা নামিয়ে বললেন, ফুর্তিফার্তা করতে চাও করে নাও, কিন্তু বিয়ে করার সময় খবরদার—দেশ থেকে বিয়ে করে আনবে, বাবা-মা যেটা ঠিক করে। এই যে আমি? চার-চারটা প্রেম করেছি, কিন্তু বিয়ে করার সময় বাবা যেটা ঠিক করেছে সেটা। হাঃ হাঃ হা!

তারিকের প্রথম বার সন্দেহ হতে থাকে ভালো খাবার এবং আমজাদ সাহেবের সুন্দরী শ্যালিকাকে দেখার জন্যে চলে আসাটা সুবিবেচনার কাজ হয় নি। জিজ্ঞেস করল, আর কেউ আসবে না?

হ্যাঁ, আসবে। ফরিদ আর জামাল। আতাউরেরও আসার কথা ছিল, কাজ পড়ে গেল।

তারিক একটু মুষড়ে গেল। ফরিদ আর জামাল এই দুজনের কারো সাথেই তার সেরকম পরিচয় নেই। ফরিদ ছেলেটিকে তো সে একটু পাগলাগোছের বলেই জানে। জামাল ছেলেটি আবার একেবারে অন্য চরিত্র, আমেরিকার জলহাওয়ার সাথে পুরোপুরি মিশে গিয়েছে—কথাবার্তা চালচলনে বাঙালির কোনো চিহ্নই আর অবশিষ্ট নেই। সেই তুলনায় আতাউর ছেলেটি মিশুক ধরনের ছিল, কথাবার্তায় ভালো। বুদ্ধিও রাখে বেশ—আজকের দাওয়াতটি থেকে যেভাবে খসে পড়ল, সেটা থেকেই বোঝা যায়। তারিক আবার নিজেকে গালি দিল এভাবে হুট করে চলে আসার জন্যে।

আমজাদ সাহেবের ঘরটি যত্ন করে সাজানো, কিন্তু একবার চোখ বোলালেই বোঝা যায় কোথাও কিছু-একটা গোলমাল আছে। ঘরের দুই পাশে দুই রকমের সোফা, অত্যন্ত দামী কিন্তু দু রকম। নিশ্চয়ই সেলে পেয়ে সস্তায় আলাদা আলাদা কিনেছেন। তা ছাড়াও সারা ঘরে সোনালি রঙের একটা প্রাদুর্ভাব। ছবির ফ্রেমের রং সোনালি, আয়নায় ফ্রেম সোনালি, মটকার মতো বড় বড় দুটো সোনালি পিতলের

ফুলদানি এবং মাথার কাছে বড় সোনালি পিতলের ফ্রেমে কলমা লেখা একটা ফ্রেম। ঘরের এক কোণায় একটি অতিকায় বাঘের মূর্তি, সেটি শুধু সোনালি নয়, উপরে কালো ডোরা কাটা দাগ। মূর্তিটা দেখলে যে-জিনিসটি নিয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না, সেটি হচ্ছে এটা একটা পুরুষ বাঘ, কারণ পিছনের দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে অতিকায় এক জোড়া অণ্ডকোষ ঝুলছে। কোনো মানুষ এই রকম কুৎসিত একটা প্রাণী তৈরি করতে পারে বিশ্বাস করা শক্ত। কেউ সেটা পয়সা খরচ করে কিনতে পারে সেটা বিশ্বাস করা আরো শক্ত।

তারিক সোফায় বসে টেবিলের উপর পত্রপত্রিকায় চোখ বোলাল। সেখানে পড়ার মতো কিছু নেই, শুধু দোকানপাটের ক্যাটালগ। তারই একটা টেনে নিয়ে তারিক টেবিলল্যাম্প এবং কার্পেটের বাজার যাচাই করতে থাকে। সোনালি রঙের একটা টেবিলল্যাম্প খুব সস্তায় বিক্রি হচ্ছে, একটা কিনলে আরেকটা অর্ধেক দামে ছেড়ে দেয়া হবে। আমজাদ সাহেবের বাসায় টেবিলল্যাম্পের জোড়া চলে আসতে খুব বেশি দেরি নেই মনে হচ্ছে!

আমজাদ সাহেব একটা বড় গ্লাস বোঝাই করে গাঢ় হলুদ রঙের একটা পানীয় নিয়ে হাজির হলেন। কাউকে কিছু খেতে দেবার আগে সে সেটা খেতে চায় কি না সেটা জিজ্ঞেস করা ভদ্রতা। আমজাদ সাহেব হয় সেটা জানেন না, না হয় সেটা নিয়ে মাথা ঘামান না। তারিক জিজ্ঞেস করল, এটা আমার জন্যে?

হ্যাঁ। খেয়ে দেখ। তোমার ভাবী তৈরি করেছে—আমের লাচ্ছি।

আম?

হ্যাঁ, দেশের আম থেকে হান্ড্রেড টাইমস বেটার। ল্যাংড়া আমের বাবা।

ডিনারের আগে এত বড় গ্লাসে আমের লাচ্ছি খাব?

খাও খাও। ডিনারের দেরি আছে।

তারিক আরো মুষড়ে গেল, ডিনারের দেরি আছে মানে? আরো কতক্ষণ এই যন্ত্রণার মাঝে থাকতে হবে?

আমজাদ সাহেব সামনের সোফায় বসে রিমোট কন্ট্রোলটি হাতে নিয়ে টেলিভিশনটি চালু করে দিলেন। চ্যানেল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটি অনুষ্ঠান খুঁজে বের করলেন, যেখানে দেখানো হচ্ছে একজন বিপত্নীক মানুষ আরেকজন বিধবাকে বিয়ে করে কী রকম বিপদে পড়েছে তার কাহিনী। প্রতি তিরিশ সেকেন্ড পরপর দর্শকদের উচ্চস্বরে হাসির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে এটা হাসির অনুষ্ঠান, এমনিতে দেখে সেটা সহজে বোঝার উপায় নেই। অনুষ্ঠানটি আমজাদ সাহেবের খুব পছন্দসই বলে মনে হল, কারণ তিনিও হাঁটু মুড়ে বসে একটু পরে পরে উচ্চস্বরে হাসতে শুরু করলেন।

তারিক সাবধানে ঘড়ি দেখে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল।

ফরিদ আর জামাল এল আরো প্রায় আধ ঘণ্টা পর। এর মাঝে আমজাদ সাহেবের স্ত্রী গাঢ় হলুদ রঙের তরলটি দিয়ে তারিকের গ্লাসটি দ্বিতীয় বার ভরে দিয়ে গেছেন।

জিনিসটি খেতে সত্যিই চমৎকার। আমজাদ সাহেবের স্ত্রী নিশ্চয়ই আমগুলিকে হাত দিয়ে চটকে চটকে এটা তৈরি করেছেন। ব্যাপারটা চিন্তা করে একটু ঘেন্না ঘেন্না লাগছিল, কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই যে জিনিসটা খেতে ভালো। আমজাদ সাহেবও এর মাঝে প্রথম অনুষ্ঠানটি শেষ করে দ্বিতীয় অনুষ্ঠানে মন দিয়েছেন। গোঁফওয়ালা একজন প্রতিবেদক সমাজের জটিল সমস্যা বিশ্লেষণ করার ভান করে অত্যন্ত কুৎসিত কিছু বিষয়ের অবতারণা করছে। রগরগে জিনিস দেখে বেশ সময় কেটে যায়।

ফরিদ আর জামাল আলাদা আলাদা এলেও ঘরে ঢুকল প্রায় একসাথে। জামালের হাতে কিছু ফুল। তারিক ভেবে ভেবে মনে করতে পারল না এর আগে সে অন্য কোনো বাঙালিকে ফুল কিনতে দেখেছে কি না। সে নিজে খালিহাতে এসেছে ভেবে হঠাৎ তার একটু লজ্জা লজ্জা লাগতে থাকে।

জামাল লম্বা এবং বেশ সুদর্শন। তারিক অস্বীকার করবে না যে জামাল সুদর্শন, কিন্তু মেয়েরা যেভাবে জামালের চেহারার বর্ণনা দেয়ার সময় নিজেদের শারীরিক আকর্ষণ গোপন করার কোনো চেষ্টা করে না, সেটি বেশ বিচিত্র। মেয়েদের মুখে জামালের চেহারা এবং শরীরের প্রশংসা শুনে তারিক অন্য দশজন পুরুষের মতোই সব সময়ে ভিতরে ভিতরে ঈর্ষার খোঁচা অনুভব করেছে। তারিকের হিসেবে জামালের চেহারা আহামরি কিছু হওয়ার কথা নয়। রোমশ দেহ, পেশিবহুল শরীর, জোড়া ভুরু, খসখসে মুখ, বড় গোঁফ, ঝাঁকড়া চুল এবং প্রত্যেকটা জিনিসের মাঝে কেমন জানি জন্তু জন্তু ভাব রয়েছে, বিচিত্র কারণে মেয়েরা মনে হয় এটাকে পুরুষালি চিহ্ন হিসেবে ধরে নেয়। তারিক নিজে যে-সমস্ত মানুষকে অত্যন্ত সুদর্শন বলে জেনে এসেছে, মেয়েরা তাদেরকে মেয়েলি চেহারা বলে এককথায় নাকচ করে দেয়। সুদর্শন কথাটির অর্থ মেয়েদের এবং ছেলেদের কাছে সম্পূর্ণ আলাদা।

জামালের ভাবভঙ্গি খুব সপ্রতিভ। তারিক যদি ফুল নিয়ে হাজির হত, সেটা কেমন করে দেবে সেটা নিয়ে একটু সমস্যায় পড়ে যেত। জামালের কোনো সমস্যা হল না। রান্নাঘরে ঢুকে আমজাদ সাহেবের স্ত্রীকে খুঁজে বের করে তার হাতে ধরিয়ে দিল। মোটাসোটা মহিলা ঘামে ভিজে একেবারে জবজবে হয়ে ছিলেন, ফুলগুলি পেয়ে একেবারে কৃতার্থ হয়ে গেলেন। জামাল নিজেই একটা ফুলদানি বের করে সেখানে খানিকটা পানি ঢেলে ফুলগুলি সাজিয়ে রাখতে সাহায্য করল। বলল, যা সুন্দর গোলাপ ছিল ফুলের দোকানে, কিন্তু এত দাম—হাত দেয়ার উপায় নেই! এগুলিও খারাপ না, সাথে দেখেন একটু প্লান্ট ফুড দিয়ে দিয়েছে, পানিতে মিশিয়ে দেবেন—তিন সপ্তাহে এই ফুলের কিছু হবে না। একটু থেমে যোগ করল, ভাবী, আপনার রান্নার কী খবর? সাহায্য লাগবে কিছু?

কথাবার্তার বেশির ভাগ ইংরেজিতে, কায়দাকানুন অত্যন্ত মার্জিত। এই লোককে যদি মেয়েরা পছন্দ না করে, কাকে করবে?

বসার ঘরে ফরিদ মোটামুটি মুখ ভার করে বসে ছিল। আমজাদ সাহেব রগরগে অনুষ্ঠানটি হাঁ করে গিলছেন, কথাবার্তা বলার জন্যে পরিবেশটি খুব সুবিধের নয়।

জামাল এসে রক্ষা করল, আমজাদ সাহেবকে বলল, টেলিভিশনটা বন্ধ করে দিই, কী বলেন?

আমজাদ সাহেব কিছু বলার আগেই সুইচ টিপে টেলিভিশনটি বন্ধ করে বলল, টেলিভিশন চলতে থাকলে কথা বলা যায় না। আর যা বাজে প্রোগ্রাম দেখায়—যত কম দেখা যায় ততই ভালো। এই যে লোকটা প্রোগ্রাম করছে, এর নাম জিরাল্ডো। একে জেলখানায় আটকে রাখার কথা—মহা বদমাইশ ব্যক্তি।

আমজাদ সাহেব কিছু বলার সুযোগ পেলেন না। জামাল তারিকের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, ডক্টর তারিক, ভালো আছেন? অনেকদিন পর দেখা।

ইংরেজিতে কথা হচ্ছে, তারিক তাই ইংরেজিতেই উত্তর দিল, হ্যাঁ, অনেকদিন পর।

আপনার টেলিফোন নাম্বারটা নিয়ে যাব আজ। আপনার সাথে আমার একটু যোগাযোগ রাখা দরকার।

আমার সাথে?

হ্যাঁ।

কী ব্যাপার?

আমার কাজের ব্যাপারে। আপনি তো সায়েন্টিস্ট মানুষ, সে জন্যে।

জামাল সম্ভবত একজন ইঞ্জিনিয়ার। কিসের ইঞ্জিনিয়ার তারিক ঠিক জানে না। জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, ঠিত তখন আমজাদ সাহেবের স্ত্রী তার বোনকে নিয়ে হাজির হলেন, বললেন, এই যে আমার ছোট বোন মিলি। বায়োকেমিস্ট্রিতে পিএইচ. ডি. করতে এসেছে ইউ. এস. সি.-তে। খুব ভালো ছাত্রী, আমার মতো না।

আমজাদ সাহেবের স্ত্রীকে সুন্দরী বলা যায় না। কোনো একসময়ে হয়তো সুন্দরী ছিলেন, কিন্তু বয়স এবং মেদে তা আড়াল পড়ে গেছে। তার বোন যে এত সুন্দরী হতে পারে তারিক কল্পনাও করে নি। শুধু যে সুন্দরী তাই নয়, চেহারায় কিছু-একটা আছে, যে-কারণে চট করে চোখ সরিয়ে নেয়া যায় না। হালকা নীল রঙের একটা শাড়ি পরেছে। নূতন এসেছে এদেশে বোঝাই যাচ্ছে, না হয় এই বয়সী মেয়ে কি আর কখনো শাড়ি পরে থাকে? চোখে-মুখে প্রসাধনের কোনো চিহ্ন নেই, তাই কেমন একটা সতেজ ভাব উঁকি দিচ্ছে। আমজাদ সাহেবের স্ত্রী পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, মিলি, এ হচ্ছে ফরিদ, এ হল জামাল আর ইনি হচ্ছেন তারেক। ডক্টর তারেক।

মিলির দৃষ্টি সবার উপর ঘুরে জামালের উপর ফিরে এসে সেখানেই আটকে গেল। আমজাদ সাহেবের স্ত্রী বললেন, মিলি বায়োকেমিস্ট্রিতে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে।

তুমি থামবে আপা?

মাত্র দুইটা ফার্স্ট ক্লাস ছিল এই বছরে।

মিলি বিব্রত হয়ে বলল, আপা, কী যে কর তুমি!

জামাল প্রথম বার বাংলায় কথা বলল, জিজ্ঞেস করল, কেমন লাগছে আপনার?

উচ্চারণে কেমন একটা আড়ষ্ট ভাব।

মিলি উত্তর দেবার আগেই আমজাদ সাহেবের স্ত্রী বললেন, সেদিনের একফোঁটা মেয়ে, আপনি করে বলছেন কি!

জামাল এবারে আপনি তুমির ঝামেলায় না গিয়ে জিজ্ঞেস করল, কেমন লাগছে?

আবার আমজাদ সাহেবের স্ত্রী উত্তর দিলেন, বললেন, কী যে মন-খারাপ, বিশ্বাস করবেন না। বলে চলে যাবে, থাকবে না এদেশে।

সে কী! জামাল সত্যি অবাক হল, ইংরেজিতে বলল, চলে যাবে কেন? প্রথম প্রথম সবার একটু খারাপ লাগে, তারপর অভ্যাস হয়ে যায়। একবার অভ্যাস হয়ে গেলে আর ফিরে যেতে মন চাইবে না।

তারিক দেখল, মিলির চোখে-মুখে হঠাৎ কেমন জানি একটা অসহায় ভাব ফুটে ওঠে। মুহূর্তের জন্যেই, সামলে নেয় নিজেকে আবার। তারপর আস্তে আস্তে বলে, আমার ভালো লাগে না, একেবারেই ভালো লাগে না।

তারিকের মায়া হল মেয়েটির জন্যে, বলল, তুমি তো তোমার বোনের সাথে আছ, আমি এসেছিলাম একা এক ডমিটরিতে। কী ভয়াবহ ব্যাপার, বিশ্বাস করবে না! না পারি খেতে, না পারি ঘুমাতে, না পারি কারো সাথে কথা বলতে। আমারও সহ্য হয়ে গেল একসময়, তোমারও হবে।

মিলি দুর্বলভাবে মাথা নেড়ে বলে, মনে হয় না।

ফরিদ দাঁত বের করে হাসে। হেসে হেসে বলে, শুনুন তাহলে আমার একটা গল্প।

ফরিদের গল্পটি খারাপ নয়। প্রথম এসে এক সপ্তাহ পর সে ঠিক করেছিল দেশে ফিরে যাবে, প্লেনের ভাড়া জোগাড় করার জন্যে সে কী করেছিল, সেটাই গল্পের বিষয়বস্তু। ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যানের কাছে কীভাবে একটা করুণ গল্প ফেঁদে বসে হাতেনাতে ধরা পড়ে গিয়েছিল, সেটি সে খুব মজা করে বলল। ফরিদকে দেখে একটু পাগলাগোছের এবং মাঝে মাঝে স্বল্পবুদ্ধির মানুষ বলেই মনে হয়। কিন্তু এত সুন্দর গুছিয়ে গল্পটি করল যে তারিক বেশ অবাক হয়ে গেল। সত্যি কথা বলতে কি, ফরিদের গল্পটি শুনে সবাই প্রথম বার সহজ স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে শুরু করল।

তারিক সন্ধে না হতেই খেয়ে নেয়। আজ খাবার দেয়া হল রাত দশটার সময়, খিদেয় তখন তার জান যায় যায় অবস্থা। ভাগ্যিস দুই গ্লাস ভরা লাচ্ছি খেয়ে রেখেছিল, না হয় এতক্ষণে তার বারটা বেজে যেত। খাবার টেবিলে খাবার দেখে তারিক বুঝতে পারে কেন এত দেরি হয়েছে। এত রকমের খাবারের যে আয়োজন করা যায়, সেটি না দেখলে বিশ্বাস হয় না। খাবারগুলি পরিবেশনও করা হয়েছে খুব সুন্দর করে, দেখে একেবারে চোখ জুড়িয়ে যায়।

ডাইনিং টেবিলটি ফুটবল মাঠের মতো। সবাই বসার পরও দুটি চেয়ার ফাঁকা রয়ে গেল। ডাইনিং টেবিল এবং চেয়ার সম্ভবত নূতন, কারণ চেয়ার এখনো প্লাস্টিকের মোড়কে ঢাকা এবং সবাই বেশ সহজভাবে তার উপর বসছে। কিংবা কে জানে আমজাদ সাহেবের সূক্ষ্ম বুদ্ধি— চেয়ারগুলি যেন ময়লা না হয়ে যায় সেজন্যে সেগুলিকে

সবসময় প্লাস্টিকের মোড়কে ঢেকে রাখা হয়।

খাওয়া শুরু করার পর প্রথম কয়েক মিনিট কোনো কথাবার্তা নেই। সবাই ভয়ানক ক্ষুধার্ত, একমনে খেয়ে চলছে। একটু পর আবার কথাবার্তা শুরু হল। তখন হঠাৎ একটি ব্যাপার ঘটল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে।

ফরিদ শাকসবজি খেয়ে মোরগের মাংস প্লেটে তুলে নিচ্ছে। আমজাদ সাহেব নিজে একটা মুরগির রান চিবাতে চিবাতে বললেন, নাও ফরিদ, ভালো করে নাও। সুপার মার্কেটের মুরগি না, একেবারে ফ্রেশ হালাল মুরগি।

তারিক জিজ্ঞেস করল, আপনি হালাল মুরগি কেনেন?

সব সময়। সুপার মার্কেটের মুরগি মুখে দেওয়া যায় নাকি? কেমিক্যাল দিয়ে বোঝাই করে রাখে।

জামাল জিজ্ঞেস করল, কোথা থেকে কেনেন?

থার্টিফোরে একটা পাকিস্তানি দোকান খুলেছে।

ফরিদ হঠাৎ থেমে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, পাকিস্তানি দোকান?

হ্যাঁ। আগে থেকে ফোন করে বলে দিই, গোশত কেটেকুটে রেডি করে রাখে।

ফরিদ মোরগের মাংসটা নিজের প্লেটে না নিয়ে বাটিতে ফিরিয়ে রাখল।

আমজাদ সাহেব বললেন, কী হল, নিচ্ছ না কেন?

এই তো নিচ্ছি— বলে ফরিদ খানিকটা সবজি তুলে নেয়।

আমজাদ সাহেব বললেন, মাংস নাও।

না— সবজিই ভালো। ফরিদ অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে প্লেটের উপর ঝুঁকে খেতে শুরু করল।

সে কী! আমজাদ সাহেব প্রায় আর্তনাদ করে বললেন, মাংস খাবে না তুমি! মুরগি? গরু? কাবাব?

না।

কেন?

সবজিই ভালো। ফরিদ কষ্ট করে একটু হাসার চেষ্টা করল।

আমজাদ সাহেব এবারে কেমন জানি একটু রেগে গেলেন। উষ্ণস্বরে বললেন, কবে থেকে তুমি ভেজিটারিয়ান হয়ে গেলে? এত কষ্ট করে সব রান্না করা হয়েছে, তুমি খাবে না মানে?

অন্যেরা খাবে। আমাকেই যে খেতে হবে সেটা কে বলেছে?

কেন খাবে না তুমি? আমজাদ সাহেব সত্যি ভয়ানক রেগে গেলেন, কেন খাবে না?

ফরিদ আমজাদ সাহেবের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি পাকিস্তানি জিনিস খাই না।

আমজাদ সাহেব কথাটা বুঝতে পারলেন বলে মনে হল না। জিজ্ঞেস করলেন, পাকিস্তানি জিনিস খাও না?

না।

কেন?

শুনবেন কেন খাই না? ফরিদের গলার স্বর হঠাৎ কেঁপে ওঠে, শুনবেন?

হ্যাঁ।

নভেম্বরের উনিশ তারিখ, একাত্তর সালের নভেম্বরের উনিশ তারিখ পাকিস্তানের মিলিটারিরা এসে আমার পাঁচ ভাইকে মেরে ফেলেছিল। একসাথে। অল রাইট? আমার চোখের সামনে। পাঁচ ভাইকে। খালি আমি বেঁচে আছি। আমি পাকিস্তানিদের সহ্য করতে পারি না— পাকিস্তানি দেখলে আমার ইচ্ছা করে গলা টেনে ছিঁড়ে ফেলি। বুঝেছেন? বুঝেছেন কেন আমি পাকিস্তানি গোশত খাই না? ফরিদ প্রায় চিৎকার করে বলল, বুঝেছেন?

আমজাদ সাহেব একটা ঢোক গিলে মাথা নাড়লেন, কিছু বললেন না। কেমন জানি অবাক হয়ে ফরিদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। জামাল একমাত্র মানুষ, যে কাঁটাচামচ দিয়ে ভাত খাচ্ছিল, প্লেটের উপর কাঁটাচামচ রেখে ফরিদের দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে বলল, আমি খুব দুঃখিত যে, তোমার পাঁচ ভাইকে মিলিটারিরা মেরে ফেলেছিল। খুবই দুঃখিত।

কথাটা ইংরেজিতে বলে রক্ষা। বাংলায় এ ধরনের মেকি মাপা কথা শুনলে কেমন জানি গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

ফরিদ কোনো উত্তর দিল না। সবাই দেখল, সে অল্প অল্প কাঁপছে।

পরিবেশটা আশ্চর্যরকম আড়ষ্ট হয়ে গেল। তারিক, জামাল এবং আমজাদ সাহেবের স্ত্রী কয়েকবার পরিবেশটা সরল করার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল।

তারিক তার জীবনে কখনো এত ভালো খাবার এত কষ্ট করে খায় নি।

৩

ফরিদের ঠিক পিছনে একটা অতিকায় বাইশচাকার ট্রাক। ট্রাকটি একবার হাই বীম জ্বালিয়ে ফরিদকে ইঙ্গিত দিল তার সামনে থেকে সরে যেতে। ফরিদ গাড়ি চালাতে চালাতে রীয়ার ভিউ মিররে পিছনে তাকিয়ে মহা খাপ্পা হয়ে বলল, শালার ব্যাটা, ডান দিকে তো লেন খালি আছে, যা না কেন?

কথাটি ট্রাক ড্রাইভারের উদ্দেশে বলা, যদিও তার কানে পৌঁছানোর কোনো সম্ভাবনা নেই। তারিক বলল, কী হয়েছে ফরিদ?

দেখেন না শালার ব্যাটার কাজকারবার! আমাকে হাই বীম দেখায়!

পিছনের ট্রাকটি আবার হাই বীম জ্বালিয়ে তার বিরক্তি প্রকাশ করল। ফরিদ হঠাৎ

ক্ষেপে গিয়ে বলল, শালা, দাঁড়া তোকে দেখাই মজা!

তারিক একটু শঙ্কিত হয়ে বলল, কী করবে?

শালাকে টাইট দিই। দেখেন মজা— কথা শেষ করার আগেই হঠাৎ ফরিদ তার গাড়ির ব্রেকে চাপ দেয়, সীট-বেল্টে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা— না হয় উইন্ড শীল্ডে মাথা ঠুকে তারিকের বারটা বেজে যেত। ষাট মাইলের গাড়িকে চোখের পলকে চল্লিশে নামিয়ে আনে ফরিদ। পিছনের দৈত্যের মতো ট্রাক প্রাণপণে ব্রেক কষে অ্যাকসিডেন্ট বাঁচানোর চেষ্টা করে। ট্রাকের কর্কশ হর্নে কান ঝালাপালা হয়ে যায়। তারিক ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলে, কী করছ ফরিদ? কী করছ?

ফরিদ কথার উত্তর না দিয়ে আবার পিছনে তাকায়, তারপর ব্রেকে চাপ দিয়ে গাড়ির বেগ কমিয়ে একেবারে ত্রিশের কাছাকাছি নামিয়ে আনে। প্রচণ্ড হর্ন বাজিয়ে পিছনের ট্রাক প্রাণপণে ব্রেক কষে কোনোমতে পাশের লেনে সরে যায়।

ফরিদ দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলল, বোঝ শালার ব্যাটা মজা এখন!

ট্রাকটা গতি বাড়িয়ে আসার চেষ্টা করছে, ফরিদ এক্সেলেটারে চাপ দিয়ে মুহূর্তে বের হয়ে গেল। তারিক এতক্ষণ নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে ছিল, কোনোমতে বলল, কী করলে তুমি এটা? কী করলে?

ফরিদ হাসতে হাসতে বলল, ট্রাকের আঠারোটা গিয়ার। যদি কোনোদিন ট্রাক ড্রাইভারকে ক্ষেপাতে চান, তাদের সামনে ব্রেক করবেন, শালাদের একটা একটা করে গিয়ার চেঞ্জ করে আবার স্পীড তুলতে জান বের হয়ে যায়। হাঃ হাঃ হাঃ—

ফরিদের কাজকর্মের সাথে তারিকের ভালো পরিচয় নেই। হাই বীম জ্বালিয়ে সামনের লেন থেকে কাউকে সরে যাবার ইঙ্গিত দেবার জন্যে একজন ট্রাক ড্রাইভারকে এভাবে শাস্তি দেয়া যায় কে জানত! যদি ট্রাক ড্রাইভার সময়মতো ব্রেক করতে না পারত?

ফরিদের অনেক আনন্দ হচ্ছে বলাই বাহুল্য। মুখের হাসি আটকে রেখে জিজ্ঞেস করল, স্বয়ংবর পার্টি কেমন দেখলেন?

কি পার্টি?

স্বয়ংবরই তো বলে, বলে না? যেখানে মেয়েরা নিজেদের বর বেছে নেয়?

হ্যাঁ। ফরিদ কী বলতে চাইছে হঠাৎ করে তারিক আন্দাজ করতে পারে। একটু কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল, স্বয়ংবর পার্টি কেন বলছ?

কাকে কাকে ডেকেছে দেখছেন না? আপনি, আমি, জামাল আর আতাউর— চার ব্যাচেলর। হাঃ হাঃ হাঃ— মিলির জন্য জামাই খোঁজা হচ্ছে। মনে হয় নজর জামালের দিকে। জানে না তো কিছু!

কি জানে না?

জামালের কথা।

কি কথা?

সে যে কত বড় মাগীবাজ!

এ্যাঁ?

ফরিদ দুলে দুলে হাসে, জামালকে আমি পমোনা কলেজ থেকে চিনি। একসাথে আমরা কলেজে গিয়েছিলাম। বি. এস. করে আমি পিএইচ. ডি. করতে গিয়েছি, সে চাকরিতে ঢুকেছে। যখন পমোনা কলেজে ছিলাম, সব মেয়েরা আমার ঘরে এসে বসে থাকত। কেন জানেন?

কেন?

জামালের সাথে তার পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য। আপনি বিশ্বাস করবেন না—

তাই নাকি?

হ্যাঁ! চেহারা যে মেয়েদের কেমন পাগল করে আপনি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। সাদাসিধে ছেলে ছিল। তারিক ভাই, দেখতে দেখতে চোখের সামনে মাগীবাজ হয়ে গেল! হবে না কেন? আমার পিছনে মেয়েরা যদি এভাবে ঝুলে থাকত, আমিও হতাম—আপনার পিছনে ঝুলে থাকলে আপনিও হতেন।

তারিক আস্তে আস্তে বলল, ইন্টারেস্টিং! সে মনে করার চেষ্টা করে, কখনো কি হয়েছে কোনো মেয়ে তার সম্পর্কে নিজের থেকে উৎসাহ দেখিয়েছে? তারিক মনে করতে পারে না। আবার সে বুকের মাঝে একটা ঈর্ষার খোঁচা অনুভব করে।

বুঝলেন তারিক ভাই, একটা মেয়েকে বেছে নেয়। সপ্তাহখানেক তার সাথে থাকে। বড়জোর এক মাস। তারপর আরেকজন। আমজাদ সাহেব তো জানেন না— ভেবেছেন শালীকে গছিয়ে দেবেন। হাঃ হাঃ হাঃ—বলে না, বাঘ যদি মানুষের রক্তের স্বাদ পায় তখন খালি মানুষ খেতে চায়? জামাল হচ্ছে সেই বাঘ! মানুষখেকো বাঘ! মেয়েমানুষ খেকো! হাঃ হাঃ হাঃ—

ফরিদ আরো নানারকম কথা বলতে থাকে। তারিক বেশ মন দিয়ে শোনে। নিজের গাড়ি নিয়ে আসে নি বলে তারিককে সে তার বাসায় নামিয়ে দিচ্ছে। তারিক তাকে যেরকম একটু পাগলাগোছের বলে জানত, সে সত্যিই তাই। তবে স্বল্পবুদ্ধি বলে যে-ধারণাটি ছিল, সেটি সত্যি নয়। পর্যবেক্ষণক্ষমতা ভালো, আজকের পার্টিটা যে মিলির সাথে স্থানীয় অবিবাহিত ছেলেদের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে, সেটা হয়তো মিথ্যা নয়।

আমজাদ সাহেব আর জন্মেও আমাকে তাঁর বাসায় ডাকবেন না। কি বলেন?

মনে হয়।

খামোকা খাওয়াটা নষ্ট হল।

তোমার দোষ ছিল না।

হ্যাঁ! আমি তো বলতে চাই নি। শালা জোর করল।

তোমার পাঁচ জন ভাই একসাথে মারা গিয়েছিল, ইস!

হ্যাঁ। হঠাৎ করে ফরিদের মুখ শক্ত হয়ে যায়। আস্তে আস্তে বলে, শালার ব্যাপারটা

www.banglabook.com

কিছুতেই ভুলতে পারি না। খালি চোখের সামনে ভাসে। দেয়ালের সামনে দাঁড়া করিয়ে শুওরেরবাচ্চারা— ফরিদ হঠাৎ কথা বন্ধ করে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেয়।

তারিক একটু অপ্রস্তুত হয়ে যায়। ফরিদের কাঁধ স্পর্শ করে বলে, থাক ফরিদ থাক। অন্য কিছু আলাপ করা যাক। আমি আসলে বুঝতে পারি নি। বোকার মতন কথাটা আবার তুলে ফেললাম—

একটা গুলি দিয়েই একজন মানুষকে মারা যায়। শুওরের বাচ্চারা গুলি করে একেবারে ঝাঁঝরা করে ফেলল— আমার বড় ভাইয়ের খুলি ফেটে— খুলি ফেটে—

তারিক আবার ফরিদের হাতে হাত রেখে বলল, ফরিদ, এখন থাক। এখন থাক—

আমার মা পাঁচটা ছেলের পাঁচটা লাশ নিয়ে বসে রইল। কাঁদতেও ভুলে গেছে। আমার মনে হল, ইস, কেউ যদি মাকে মেরে ফেলত! ছোট ছিলাম আমি, যদি বড় হতাম, তাহলে গলা টিপে মাকে মেরে ফেলতাম— গলা টিপে—

ফরিদ কথা বন্ধ করে স্টিয়ারিং হুইলটা ধরে একটা ঝাঁকুনি দেয়। গাড়িটা বিপজ্জনকভাবে তাল হারিয়ে পাশের লেনে চলে গিয়ে আবার আগের লেনে ফিরে আসে, ভাগ্যিস আশেপাশে কোনো গাড়ি নেই।

তারিক ব্যস্ত হয়ে বলল, ফরিদ, তুমি গাড়িটা থামাও। থামাও এই শোল্ডারে—

সেই শুওরের বাচ্চা পাকিস্তানি দোকানের গোশত খাওয়াবে আমাকে! আমি যে খাবারে পিশাব করে দেই নাই সেটা শালার চোদ্দপুরুষের ভাগ্য— ফরিদ আবার স্টিয়ারিং হুইল ধরে ঝাঁকুনি দিতেই গাড়িটা বিপজ্জনকভাবে ঘুরে আসে।

তারিক আরেকবার চেষ্টা করল, ফরিদ, অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যাবে, তুমি একটু শান্ত হও। না হয় থামাও পাশে—

ফরিদ হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে নাক মুছে বলল, না তারিক ভাই, ঠিক আছে। কিছু হবে না। আমি ঠিক আছি। ঠিক আছি।

সত্যি সত্যি সে নিজেকে সামলে নিল। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তারিক ভাই, আমার মাথার মাঝে কিছু-একটা গোলমাল হয়ে গেছে। নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারি না। মাঝে মাঝে কী যে হয়, মনে হয় সবকিছু ভেঙেচুরে শেষ করে দিই—

হতেই পারে ফরিদ। তুমি যে-অবস্থার ভিতর দিয়ে গিয়েছ, আমি হলে তো মনে হয় পাগলই হয়ে যেতাম!

মাঝে মাঝে মাথা ব্যথায় ফেটে যেতে চায়, চোখ খুলে তাকাতে পরি না, মাথার মাঝে শুধু সেই দৃশ্যটা ভাসে স্লো মোশানে, বারবার— বারবার— বারবার। যখন একেবারে সহ্য হয় না, তখন কী করি জানেন?

কী?

খুব একটা ব্যস্ত ক্রস সেকশানে লাল বাতির ভিতর দিয়ে আশি-নব্বই মাইলে

গাড়ি নিয়ে বের হয়ে যাই—

কী বললে! তারিকের নিজের কানকে বিশ্বাস হল না, কী বললে তুমি?

খুব একটা ব্যস্ত ক্রস সেকশানে লাল বাতির মাঝে বের হয়ে যাই।

কেন?

আমার নার্ভ শান্ত করার এই একটাই উপায়।

কিন্তু মরে যাবে তো কোনো দিন।

মনে হয়। কিন্তু কী করব বলেন? আশি-নব্বই মাইল বেগে যখন ছুটে যাই, দুই পাশ থেকে গাড়ি আসছে, সেই টেনশানটা ভয়ংকর টেনশান, সেটা ব্রেনের মাঝে কিছু-একটা করে। মাথাব্যথাটা কমে আসে। ফিরে এসে একটা লম্বা ঘুম দিই।

তুমি সত্যিই এটা কর?

হ্যাঁ।

কতবার করেছ?

অনেকবার।

কিন্তু একদিন তো মারা পড়বে!

কিন্তু কী করব আমি?

ডাক্তারের কাছে গিয়েছ? এসবের তো চিকিৎসা আছে।

নেই। এসবের চিকিৎসা নেই। ঘুমের ওষুধ খেয়ে মড়ার মতো ঘুমিয়ে থাকি, সেটা কি চিকিৎসা হল? এই রোগের একটাই চিকিৎসা, কেউ যদি আমাকে একটা কুড়াল দিত আর সেই পাকিস্তানি মিলিটারিগুলিকে ধরে দিত, কুপিয়ে কুপিয়ে যদি তাদের মাথার খুলি ফাটিয়ে ঘিলু বের করে দিতাম, তা হলে চিকিৎসা হত। এ ছাড়া আর কোনো চিকিৎসা নেই।

তারিককে বাসায় নামিয়ে দিয়ে ফরিদ চলে গেল, এক কাপ চা কিংবা কফি খেয়ে যেতে বলেছিল, ফরিদ রাজি হল না। রাতে নাকি সে চা কফি বেশি খেতে চায় না।

তারিক রাতে বিছানায় শুয়ে দীর্ঘ সময় ফরিদের কথা ভাবল। একজন মানুষকে দেখে তার ভিতরের কথা কিছুই বোঝা যায় না। খানিকটা পাগলাগোছের এই ছেলেটিকে দেখে কে বলবে ভিতরে এরকম ভয়ংকর যন্ত্রণা? অস্থিরতা দূর করার জন্যে সে ব্যস্ত রাস্তার ক্রস সেকশানে লাল বাতির মাঝে আশি-নব্বই মাইল বেগে গাড়ি নিয়ে বের হয়ে যায়— কী সর্বনাশা কথা! আজকেও কি যাবে?

তারিক হঠাৎ বিছানায় উঠে বসে। আমজাদ সাহেবের বাসায় একবার ক্ষেপে উঠেছিল ফরিদ, গাড়িতে আরেকবার। তাকে যখন নামিয়ে দিয়েছে, কথাবার্তা বলছিল না বেশি, চা খেতেও নামে নি।

এখন কি যাবে সে তার গাড়ি নিয়ে?

তারিক খানিকক্ষণ ইতস্তত করে তার টেলিফোন বই বের করে ফরিদের

টেলিফোন নাম্বারটি বের করে তাকে ফোন করল। সাতবার রিং হওয়ার পর টেলিফোন ধরল ফরিদ, ঘুম-জড়ানো গলায় বলল, হ্যালো—

ফরিদ, আমি তারিক।

ও, তারিক ভাই? কি ব্যাপার?

না— আমি আসলে— তারিক একটু লজ্জা পেয়ে গেল, ইতস্তত করে বলল, আমি আসলে ফোন করলাম দেখার জন্যে তুমি ঠিক ঠিক বাসায় পৌঁছেছ কি না। মনে হচ্ছিল আবার যদি রেড লাইটের ভিতর দিয়ে—

হাঃ হাঃ হাঃ— ফরিদ শব্দ করে হেসে উঠে বলল, না তারিক ভাই, আজকে যাই নি।

ভেরি গুড। খামোকা তোমার ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলাম মাঝরাতে।

কোনো সমস্যা নেই— আবার ঘুমিয়ে যাব আমি।

হ্যাঁ, ঘুমিয়ে যাও। আর আরেকটা জিনিস—

কি?

আবার যদি কোনোদিন তুমি রেড লাইটের ভিতর দিয়ে গাড়ি নিয়ে বের হয়ে যেতে চাও, আমাকে একবার ফোন করবে।

আপনাকে?

হ্যাঁ।

ফরিদ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ঠিক আছে।

কথা দিচ্ছ?

দিচ্ছি।

এখন তাহলে ঘুমাও। সরি, তোমাকে এত রাতে ঘুম থেকে ডেকে তুললাম।

না না, কিছু না। আপনিও ঘুমান।

টেলিফোন রেখে বিছানায় শুয়ে তারিক প্রায় সাথে সাথে ঘুমিয়ে গেল।

৪

জামাল তারিককে ফোন করে বলেছিল, সে সাড়ে দশটায় আসবে, একেবারে কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে দশটায় সে একটি আমেরিকান মেয়েকে নিয়ে হাজির হল। মেয়েটির লম্বা সোনালি চুল, নীল চোখ এবং আমেরিকান ধাঁচের একটু লম্বাটে মুখ। বাড়াবাড়ি রকমের সুন্দরী নয়, কিন্তু সুন্দর করে সেজে আছে বলে বেশ চমৎকার দেখাচ্ছে। দেখে বোঝা যায় মেয়েটি স্কুল-কলেজের ছাত্রী নয়। দামী স্কার্ট, চকচকে জুতো, চামড়ার ব্যাগ— নিশ্চয়ই কোথাও কাজ করে। জামাল মেয়েটির সাথে তারিকের পরিচয় করিয়ে দিল— নাম ন্যান্সি। একটা ব্যাংকে কাজ করে। ন্যান্সি মেয়েটির কথাবার্তা

ভাবভঙ্গিতে একটা আদুরে বিড়ালের ভাবভঙ্গি আছে, সারাক্ষণ সে জামালের গায়ের সাথে একেবারে আঠার মতো লেগে রইল।

জামাল আগের দিন ফোন করে সময় ঠিক করেছিল, তারিকের সাথে একটা ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে চায়। কি ব্যাপার পরিষ্কার করে বলে নি, তার অফিসের কোনো-একটা কাজ, সেরকম ইঙ্গিত দিয়েছে। তারিক তার অগোছালো অফিসে ঠেলেঠুলে দু'টি খালি চেয়ার পেতে বলল, তারপর, হঠাৎ করে কী মনে করে?

একটা কাজে এসেছি। আমি যেখানে কাজ করি সেটাকে সবাই ঠাট্টা করে বলে গুয়ের কারখানা।

কিসের কারখানা?

গু— মানে পায়খানা।

ন্যান্সি জামালকে কনুই দিয়ে একটা খোঁচা দিয়ে মুখে হাত চেপে হেসে ফেলল। তারিক চোখ বড় বড় করে বলল, পায়খানা তৈরি করতে কারখানা লাগে সেটা তো জানতাম না!

জামাল শব্দ করে হেসে বলল, তৈরি করতে লাগে না, কিন্তু সেটার গতি করতে লাগে। আসলে ঠিক পায়খানা নয়, আমাদের কোম্পানি হচ্ছে বড় ধরনের রাসায়নিক জঞ্জাল, বিষাক্ত কেমিক্যাল— এইসব পরিষ্কার করার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ, আমরা তাই ঠাট্টা করে সব রকম জঞ্জালকে সোজা কথায় পায়খানা বলি।

তাই বলেন!

এবারে আমাদের কোম্পানি একটা খুব বড় অর্ডার পেতে পারে। একটা অনেক পুরানো নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর পরিষ্কার করা। সেখানে নানারকম তেজস্ক্রিয় জিনিসপত্র আছে, সেগুলিকেও সরাতে হবে। কোম্পানির হেড অফিস থেকে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে চিঠি এসেছে, কারা কারা তেজস্ক্রিয় জিনিসপত্র নিয়ে কাজ করতে চায়। সবাই না করে দিয়েছে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। আমরা তো এ লাইনের মানুষ নই, তেজস্ক্রিয় কথাটি শুনলেই কেমন জানি ভয়-ভয় লাগতে থাকে। শুধু মনে হয় খাসি হয়ে যাব।

খাসি হয়ে যাবেন? তারিক অবাক হয়ে বলল, খাসি হয়ে যাবেন মানে?

ও! আপনি শোনেন নি? বলা হয়ে থাকে তেজস্ক্রিয় জিনিসপত্র নিয়ে কাজ করলে মানুষ নপুংশক হয়ে যায়।

ন্যান্সি কনুই দিয়ে জামালকে বেশ জোরে একটা গুঁতো দিয়ে বলল, খুব ভয় মনে হচ্ছে তোমার?

জামাল গুঁতোটি সহ্য করে আবার তারিককে বলল, আপনার কাছে আমি এসেছি একটু পরিষ্কারভাবে জানার জন্যে ব্যাপারটা কি। এই তেজস্ক্রিয় জিনিসপত্রে আসলেই ভয় আছে কি? থাকলে কী রকম ভয়। যদি ঠিকভাবে নিজেকে সাবধানে রাখা হয়, কোনো ক্ষতি হতে পারে কি না— এইসব। বুঝতেই পারছেন কোম্পানির যে অবস্থা,

www.banglabook.com

আমি যদি এখন এই কাজটা নিই, তা হলে একেবারে চোখ বন্ধ করে প্রমোশন।

তাই বলেন! তারিক একগাল হেসে বলল, আমাকে আধা ঘন্টা সময় দেন, আপনাকে আমি একটা ছোটখাটো তেজস্ক্রিয় বিশেষজ্ঞ বানিয়ে দেব।

জামাল খুশি হয়ে বলল, তা হলে তো কোনো কথাই নেই।

তারিক তখন জামালকে তেজস্ক্রিয় পদার্থের উপর একটা লম্বা লেকচার দিল। অফিসের হোয়াইট বোর্ডে মার্কার দিয়ে নানারকম ছবি এঁকে দেখাল, সংখ্যা, মাত্রা বিশেষত্ব লিখে দিল। জামাল গম্ভীর হয়ে মাথা নেড়ে লেকচারটি শুনল। পকেট থেকে নোটবই বের করে বিভিন্ন তথ্য টুকে নিল। লেকচার শেষ করে তারিক জামাল আর ন্যান্সিকে নিচে ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গেল তেজস্ক্রিয় পদার্থ দেখানোর জন্যে। দীর্ঘ সময় নিয়ে সে দেখাল কোনটা কী রকম, কোনটার কী ধরনের ক্ষতি করার ক্ষমতা, কোনটা থেকে কীভাবে রক্ষা পেতে হয়, কোনটা কীভাবে মাপতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

সবকিছু দেখেশুনে জামালের চোখ চকচক করতে থাকে উত্তেজনায়, তারিকের সাথে শক্ত করে হাত মিলিয়ে বারবার হাত ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, ওহ্! আপনি যে আমার কী উপকার করলেন কী বলব!

কেন?

এই প্রথম বার আমার ব্যাপারটা সম্পর্কে একটা ধারণা হল, পরিষ্কার একটা ধারণা হল। অন্ধ একটা ভয় ছিল আগে, ভয়টা কেটে গেছে। আগে ভাবতাম তেজস্ক্রিয় জিনিস মানেই সাংঘাতিক কিছু, এখন জেনে গেলাম মহাকাশ থেকে কসমিক রে আমাদের শরীরের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে সব সময়। এখন আর ভয় পাব না। মনে করব না তেজস্ক্রিয় জিনিসের কাছে গেলেই সীসা দিয়ে তৈরী একটা আন্ডারওয়ার পরে যেতে হবে—

ন্যান্সি আবার কনুই দিয়ে একটা খোঁচা মেরে বলল, থাম দেখি! তোমার খালি বাজে কথা!

জামাল খোঁচাটি হাসিমুখে সহ্য করে বলল, এবারে আমার প্রমোশন আটকায় কে?

তারিক বলল, যখন আপনার প্রমোশন হবে আমাকে একপেট খাইয়ে দেবেন।

একপেট কী বলছেন! আপনাকে আমি হাওয়াই নিয়ে যাব! বাহামা নিয়ে যাব! ইউরোপ নিয়ে যাব!

ন্যান্সি বলল, এই যে আমি সাক্ষী থাকলাম। যদি না নিয়ে যাও, দেখো আমি কী করি তোমার অবস্থা!

ল্যাবরেটরি থেকে বের হয়েই জামাল একটু গম্ভীর হয়ে গেল, ন্যান্সি একটু আদুরে গলায় বলল, কি হল জামাল! তোমার মুখ এত ভারি কেন হঠাৎ?

জামাল বলল, তোমার সাথে আমার একটা কথা বলার ছিল।

কি কথা?

কোথাও বসে বলতে হবে সেটা।

ন্যান্সি পথে পা ছড়িয়ে বসে তরল গলায় বলল, এই যে বসে গেলাম।

জামাল হাত ধরে টেনে তুলে বলল, ঠাট্টা না, সত্যি বলছি।

কী এমন কথা যে তুমি না বসে বলতে পারবে না?

আছে।

ঠিক আছে চল, তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাই। দারুণ একটা রেস্টুরেন্ট। খেতে খেতে কথা হবে। সীফুড ভালো লাগে তোমার?

নাহ্! মাছের আঁশটে গন্ধ বড় খারাপ লাগে।

তা হলে চল মেক্সিকান খাই। মেক্সিকান কেমন লাগে?

ভালো। চীজটা একটু বেশি দেয়।

বলে দেব, তোমাকে কম করে দেবে।

রেস্টুরেন্টটা চমৎকার। খাবার খুব ভালো, কিন্তু খাবার মাঝখানে গিটার নিয়ে কিছু মানুষ উচ্চস্বরে স্প্যানিশ ভাষায় গান গাইতে থাকে, সেটাই হচ্ছে সমস্যা। এর মাঝেও দু' জনে খুব তৃপ্তি করে খেল। খাবারের শেষের দিকে জামাল বলল, ন্যান্সি, তোমাকে আমি একটা কথা বলতে চাই।

কি কথা?

কীভাবে শুরু করব, ঠিক বুঝতে পারছি না।

জামালের গলার স্বরে কিছু-একটা ছিল, ন্যান্সি হঠাৎ একটু শঙ্কিত হয়ে ওঠে। ভীত গলায় বলে, কী বলতে চাও তুমি?

যখন তোমার সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল, আমি তোমাকে বলেছিলাম, আমাদের সম্পর্ক হবে হালকা, এর মাঝে কোনো গভীরতা আসতে পারবে না। মনে আছে?

আছে।

তোমাকে দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে তুমি আমাদের সম্পর্কটাকে খুব বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলেছ। ভুল বলেছি?

তুমি কেন এটা জিজ্ঞেস করছ?

আমি কোনোরকম সিরিয়াস সম্পর্ক বিশ্বাস করি না।

কেন?

আমি— আমি— বলতে পার একজন পশুপ্রকৃতির লোক। আমার ভিতরে প্রেম-ভালবাসা এসব কিছু নেই। শরীর ছাড়া আমি কিন্তু কিছু বুঝি না। কয়দিন থেকে লক্ষ করছি, আমার ব্যাপারে তুমি খুব ইমোশনাল হয়ে পড়ছ। মনে হচ্ছে তুমি আমাকে ভালবাসতে শুরু করেছ—

জামাল—

আমাকে শেষ করতে দাও। আমি দেখেছি, তুমি আজকাল প্রেম–ভালবাসার কথা বল। এটা ঠিক নয় ন্যান্সি, এটা একেবারে ঠিক নয়। আমার জন্যে কেউ যেন দুঃখ না পায়।

জামাল—

আমার মনে হয় আমাদের দু' জনের সম্পর্কটা এখানেই শেষ করে দেয়া ভালো। সবচেয়ে ভালো হয় আর যদি আমাদের দেখা না হয়।

ন্যান্সি হঠাৎ জাপটে জামালের হাত ধরে ফেলল, কাতর গলায় বলল, জামাল, তুমি এরকম করে কথা বলো না, প্লীজ!

জামাল হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, ন্যান্সি, বিশ্বাস কর, আমি খুব নিচুস্তরের একটা পশুর মতো। আমার ভিতরে প্রেম–ভালবাসা নেই—

জামাল! আমার বুকভরা ভালবাসা, তোমার না থাকলে আমি আমারটা দিয়ে তোমারটা পুষিয়ে নেব।

ন্যান্সি, সুন্দর করে কথা বললেই কথা সত্যি হয়ে যায় না।

জামাল, আমি সত্যিই তোমাকে ভালবাসি। নিজেকে মানুষ যত ভালবাসে তার থেকে হাজার গুণ বেশি ভালবাসি। তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না, তুমি আমাকে ছেড়ে যেয়ো না। প্লীজ—

ন্যান্সি, এটা সত্যি কথা নয়। আমি অনেকবার এই কথা শুনেছি। অনেকে বলেছে যে তারা আমাকে ছাড়া থাকতে পারবে না, আমাকে ছাড়া বাঁচবে না। সবাই চমৎকার বেঁচে আছে। সবাই সুখে আছে। আমাকে নিয়েই কেউ সুখী হত না। আমি খুব স্বার্থপর নীচ মনের মানুষ—

জামাল! বিশ্বাস কর আমার কথা— বিশ্বাস কর—আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচব না। বিশ্বাস কর বিশ্বাস কর—

আমি তোমাকে বিশ্বাস করি ন্যান্সি। কিন্তু তোমারও আমাকে বিশ্বাস করতে হবে। জামাল ন্যান্সির চোখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে স্পষ্ট কাটা কাটা স্বরে বলল, তোমার জন্যে আমার এতটুকু ভালবাসা নেই ন্যান্সি। কারো জন্যে নেই। কখনো ছিল না।

জামালের চোখের দিকে তাকিয়ে ন্যান্সি হঠাৎ কেঁপে ওঠে। পাথরের মতো নিষ্পলক দৃষ্টিতে খানিকটা অনুকম্পা, খানিকটা বিতৃষ্ণা এবং খানিকটা ঘৃণা। কিন্তু সেখানে কোনো ভালবাসা নেই। এতটুকু ভালবাসা নেই।

ন্যান্সি হঠাৎ করে বুঝতে পারে, জামাল সত্যি কথা বলছে। এই অসম্ভব সুদর্শন মানুষটির বুকে কোনো ভালবাসা নেই। তার চোখে পানি এসে যায় হঠাৎ। প্রাণপণে সে চোখের পানিকে আটকে রাখার চেষ্টা করে, এই নিষ্ঠুর হৃদয়হীন মানুষটির সামনে সে কাঁদতে চায় না। কিছুতেই কাঁদতে চায় না।

কিছুতেই না।

৫

তারিককে দেখে সেক্রেটারি সারা বলল, তোমাকে একজন পাগলের মতো খোঁজ করছে।

কে?

নাম গ্লেন লিভিংস্টোন।

সেটা কে?

আমি তো জানি না। ভেবেছিলাম তুমি জান।

না, আমিও জানি না। টেলিফোন নাম্বার দিয়েছে?

না, দিতে চাইল না। বলেছে, আবার ফোন করবে।

বেশ।

তরিক তার মেলবক্স থেকে চিঠিগুলি নিয়ে চোখ বোলায়। রাজ্যের সব জঞ্জাল এসে হাজির হয় রোজ। বেছে বেছে পরিষ্কার করতে করতে দেখতে পেল দেশ থেকে একটা চিঠি এসেছে। চিঠি লিখেছে গোলাম মোস্তফা সরকার নামে একজন মানুষ। নাম দেখে মানুষটাকে চিনতে পারল না, খাম খুলে চিঠিটা বের করল, ভিতরে সংক্ষিপ্ত একটা চিঠিঃ

বাবা তারিক

আমার দোয়া নিবা। পর সমাচার এই যে, দীর্ঘদিন তোমার সহিত যোগাযোগ নাই। আশা করি তুমি কুশলেই আছ।

তুমি টেলিভিশনে আমার গণমুক্তি সংস্থাটি সম্পর্কে অনুষ্ঠানটি নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। এই সংস্থাটি সম্পর্কে একটি বিশেষ বক্তৃতা দিবার জন্য আমি আমেরিকা আসিতেছি। আমি ইতঃপূর্বে কখনোই দেশের বাহিরে পদার্পণ করি নাই বলিয়া বিশেষ চিন্তাযুক্ত রহিয়াছি। আমার পাসপোর্ট তৈরি হইয়াছে, এ ব্যাপারে আমার প্রাক্তন ছাত্র ইদরিস আলি বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। গতকল্য রেজিস্ট্রি চিঠি মারফৎ আমার টিকিট আসিয়াছে। আমি আগামীকল্য বিমানের ভিসা লইতে ঢাকা যাইব। আমি চিঠির অপর পৃষ্ঠায় তোমাকে বিমানের ফ্লাইট নম্বর জানাইয়া দিলাম। তুমি অবশ্যই বিমানবন্দরে থাকিবা।

বিশেষ আর কি লিখিব? পত্রপাঠ উত্তর দিয়া আমাকে চিন্তামুক্ত করিবা।

ইতি
তোমার শিক্ষক
গোলাম মুস্তফা সরকার বি. এ

তারিক চিঠিটা দ্বিতীয় বার পড়ল। মানুষটিকে চিনতে পেরেছে, সরকার স্যার—তার একেবারে শৈশবের একজন শিক্ষক। শৈশবের সব শিক্ষকের মাঝে শুধু সরকার স্যারের কথাই তারিকের ভালো করে মনে আছে। একটু আধপাগলগোছের মানুষ ছিলেন। উৎসাহী সমাজকর্মী বলতে যা বোঝায় মোটামুটি তাই। দেশে বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী এই ধরনের ব্যাপারগুলি না থাকলে স্যারের সময় কেমন করে কাটত কে জানে! সমাজসেবাজাতীয় জিনিসগুলিতে বেশি সময় দেওয়ায় পরিবারে বড় ধরনের অশান্তি ছিল। ছেলেপিলে মানুষ হয় নি। বড় মেয়েটা পালিয়ে বিয়ে করে ফেলেছিল একজন ওয়াটার পাম্পের মেকানিককে। একটি ছেলে যাত্রাদলে ভিড়ে গিয়ে আর ফিরে আসে নি। সরকার স্যার আসলে সাংসারিক মানুষ ছিলেন না। সংসারের অশান্তি তাঁকে স্পর্শ করত বলে মনে হয় না। অনেকদিন আগের কথা। এতদিনে বুড়ো হয়ে মোটামুটি অচল হয়ে যাবার কথা, কিন্তু তিনি নাকি আমেরিকা আসছেন! একেবারে অবিশ্বাস্য ব্যাপার!

তারিক চিঠিটা তৃতীয় বার পড়ে ফেলল। 'অর্থাভাবে দিন কাটছে না, কিছু টাকা পাঠাও'— এ ধরনের চিঠির জন্যে সে প্রস্তুত, কিন্তু 'আমেরিকা আসছি—এয়ারপোর্টে থেকো'— এটা তো একেবারে অসম্ভব ব্যাপার! সরকার স্যারের আমেরিকা সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই। ধরে নিয়েছেন 'গণমুক্তি' নামে তিনি যে-সংস্থাটি চালাচ্ছেন, তারিক আমেরিকা বসে সেটি দেখেছে! তারিক মোটামুটি নিঃসন্দেহ ছিল সরকার স্যার আমেরিকার এমন একটি শহরে আসছেন, যেটি লস এঞ্জেলস শহর থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে এবং তার সেই এয়ারপোর্টে হাজির থাকার কোনো সম্ভাবনাই থাকবে না। কিন্তু দেখা গেল সরকার স্যার লস এঞ্জেলস শহরেই আসছেন। তারিক মোটামুটি নিঃসন্দেহ, এটি সরকার স্যারের কপাল যে তিনি অন্য কোনো শহরে না গিয়ে লস এঞ্জেলস শহরেই আসছেন।

তারিক তখন-তখনই সরকার স্যারকে সাহস দিয়ে একটা লম্বা চিঠি লিখে দিল। বাংলায় সে গুছিয়ে লিখতে পারে না, কিন্তু সরকার স্যারকে ইংরেজিতে একটা চিঠি লেখা সম্ভবত সুবিবেচনার কাজ হবে না। স্কুলে সে সরকার স্যারের কাছে বাংলা পড়েছে।

তারিক যখন চিঠির শেষ পর্যায়ে এসেছে, তখন গ্লেন লিভিংস্টোন নামের সেই ব্যক্তিটি আবার তাকে ফোন করল। মানুষটির কথা বলার ভঙ্গি খুব সুন্দর, শুরু করল এভাবে, ডক্টর তারিক, আমার নাম গ্লেন লিভিংস্টোন, আমি সাইকপের একজিকিউটিভ ডিরেক্টর। আমাকে তুমি গ্লেন বলে ডাকতে পার। তোমার সাথে আমি একটু কথা বলতে চাই। কোন সময়টা তোমার জন্যে সুবিধেজনক?

এখনই বলতে পার।

তুমি নিশ্চিত যে তোমার কোনো অসুবিধে হবে না?

আমি নিশ্চিত।

তোমার সাথে আমার একবার দেখা হয়েছিল।

সত্যি?

হ্যাঁ। এ. পি. এস.-এর মীটিংয়ে। তোমার নিশ্চয়ই মনে নেই তোমার সেমিনারটির পর আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, খুব ভালো সেমিনার হয়েছে।

তাই নাকি? আমার মনে নেই।

মনে থাকার কথাও না। অনেকেই বলেছিল।

তোষামুদির কথা। তারিক শুনে একটু খুশিই হল। গ্লেন লিভিংস্টোন বলল, তুমি যে-বিষয়ের উপরে সেমিনার দিয়েছিলে সেটা নিশ্চয়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আমি সেটা নিয়ে আলাপ করার জন্যে ফোন করি নি। আমি অন্য একটা জিনিস জানতে চাই।

কি জিনিস?

তুমি বলেছিলে জিনন গ্যাসে যে সিন্টিলেশান হয় তার একটা সেকন্ডারি পীক আছে।

হ্যাঁ, বলেছিলাম।

সেটা কি তুমি কোনো জার্নালে পাবলিশ করেছ?

না। পাবলিশ করার মতো কিছু না। কোথাও-না-কোথাও এটা আছে।

নেই। আমরা মেডিক্যাল ইকুইপমেন্ট তৈরি করি। ঐ রেঞ্জের সিন্টিলেশানে আমাদের খুব ইন্টারেস্ট। আমি জানি।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, তুমি এমন একটা জিনিস বের করেছ, যেটার কমার্শিয়াল ইন্টারেস্ট আছে। মেডিক্যাল ইকুইপমেন্টের বিজনেস কত বিলিওন ডলারের— কাজেই আমাদের খুব ইন্টারেস্ট! তুমি কি তোমার আবিষ্কারটা পেটেন্ট করার কথা ভেবেছ?

আবিষ্কার? ওটাকে আবিষ্কার বলছ? কী একটা যন্ত্রণা—পুরো এক্সপেরিমেন্ট ধসে যায় সেরকম অবস্থা!

গ্লেন লিভিংস্টোন শব্দ করে হাসল। বলল, তুমি তোমার এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে ভাববে, আমি ভাবব আমার বিজনেস। তোমার কাছে যন্ত্রণা আমার কাছে আবিষ্কার! তুমি কি পেটেন্টের কথা ভেবেছ?

পেটেন্ট?

হ্যাঁ।

আমি যতদূর জানি ইউনিভার্সিটি সহজে কিছু পেটেন্ট করতে চায় না, অনেক খরচ হয়। ইউনিভার্সিটি কুলিয়ে উঠতে পারে না।

কিন্তু বাইরের কোনো ইন্ডাস্ট্রি যদি ইন্টারেস্ট দেখায়?

তারিক মাথা চুলকে বলল, তা হলে অবশ্যি ভিন্ন কথা।

তোমার সাথে সেটা নিয়ে এবং আরো কয়েকটা বিষয় নিয়ে একটু খোলাখুলি কথা বলতে চাই।

আর কি বিষয়?

www.banglabook.com

এই তোমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। আমাদের কোম্পানিতে একটা রিসার্চ ডিভিশান শুরু করতে চাও কি না, এই ধরনের কথাবার্তা। আমাকে খানিকটা সময় দিতে পারবে?

অবশ্যি।

কখন তোমার সময় হবে?

যখন ইচ্ছে। আমার ঘড়ি ধরে কাজ করতে হয় না।

সামনের সপ্তাহে? শুক্রবার?

ঠিক আছে।

তা হলে সামনের শুক্রবারে আমরা একসাথে লাঞ্চ করব।

লাঞ্চ? তুমি কোথা থেকে ফোন করছ?

নিউ ইয়র্ক।

তা হলে?

আমি লস এঞ্জেলস চলে আসব।

আমার সাথে দেখা করার জন্যে, নাকি অন্য কাজ আছে?

তোমার সাথে দেখা করার জন্যে।

সেকী!

গ্লেন লিভিংস্টোন শব্দ করে হেসে উঠে বলল, ডঃ তারিক, তোমরা ইউনিভার্সিটিতে কম বাজেটে অনেক বড় বড় কাজ করে ফেল। আমরা যারা ইন্ডাস্ট্রিতে থাকি, চোখ-কান খোলা রেখে তোমাদের জন্যে বসে থাকি। ভুলিয়েভালিয়ে কোনোভাবে তোমাদের অ্যাকাডেমিক লাইন থেকে সরিয়ে ইন্ডাস্ট্রিতে নিয়ে আসতে চাই।

টেলিফোনটা রেখে তারিক খানিকক্ষণ গ্লেন লিভিংস্টোনের কথা ভাবল। খারাপ হয় না ব্যাপারটা। কিছুদিনের মাঝেই তার একটা পাকা চাকরি খোঁজার কথা। না খুঁজেই যদি চাকরিটা হাতে চলে আসে, খারাপ কি! বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এত মজার কাজ হয়তো হবে না, কিন্তু মোটা বেতনেরও তো একটা লোভ আছে!

দুপুরে জনের পেপারটার ইংরেজি শুদ্ধ করার সময় তারিক কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক কথাবার্তাও শুদ্ধ করে দিল। তার কাছে যেসব জিনিস অসম্পূর্ণ মনে হয়েছে সেগুলি লাল কালি দিয়ে দাগ দিয়ে পাশে বড় বড় প্রশ্নবোধক চিহ্ন এঁকে দিল। জন পেপারটি হাতে নিয়ে একনজর দেখে বলল, তোমাকে ইংরেজি শুদ্ধ করতে বলেছিলাম, তুমি দেখছি অন্যান্য জিনিসেও নাক গলিয়েছ।

তারিক একটু উষ্ণ হয়ে বলল, নাক আছে তাই গলিয়েছি। পেপারে আমার নামও আছে।

কিন্তু এটা আমার পেপার।

চমৎকার! তাহলে তোমার নামই রাখ। আমারটা কেটে দাও। কোনোরকম ধান্ধাবাজির মাঝে আমি নেই।

ধান্ধাবাজির কী দেখলে?

পুরোটাই ধান্ধাবাজি। এখান থেকে কিছু মেরেছ, ওখান থেকে কিছু মেরেছ। এসব অভ্যাস ভালো না জন। আমার নামটা যখন কেটে দেবে তখন আমার কাছ থেকে যেটুকু মেরেছ, সেটাও কেটে দিও। ঠিক আছে?

জনের গাল অপমানে লাল হয়ে উঠল। আস্তে আস্তে বলল, তুমি প্রথম যখন এসেছিলে, খুব ভালো স্বভাবের ছিলে। আস্তে আস্তে তোমার মেজাজ রুক্ষ হয়ে গেছে। খুব রূঢ়ভাবে কথা বল আজকাল।

তারিক একটু লজ্জা পেয়ে যায়। মুখে হাসি টেনে এনে বলে, আমি দুঃখিত জন। দোষটা কিন্তু তোমার। তুমি যদি শুরু না করতে আমি কিছু বলতাম না। তারিক হঠাৎ সুর করে গাইল—

আমরা তোমার শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে
তবু শত্রু এলে অস্ত্র হাতে লড়তে জানি—

জন চোখ বড় বড় করে বলল, এটা আবার কী বললে?

একটা গান গাইলাম।

কি গান?

আমাদের দেশে যখন যুদ্ধ হয়েছিল, সে-সময়ের গান।

এখন কেন গাইছ? তোমার গলায় খুব সুর আছে মনে হল না।

গানটাতে আমাদের চরিত্র ব্যাখ্যা করা আছে, তাই গাইলাম।

কথাগুলি কি, অনুবাদ করে শোনাও দেখি!

তারিক বলল, তোমায় জন্যে যদি অনুবাদ করা হয় তা হলে এভাবে অনুবাদ করতে হবে, আমি এমনিতে ভালোমানুষ, কিন্তু আমার পোঁদে আঙুল দিও না, তা হলে তোমার দাঁত ভেঙে ফেলব—

জন এক মুহূর্ত তারিকের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর পেট চেপে ধরে হা -হা করে হাসতে শুরু করে।

কাফেটারিয়াতে সবাই খাচ্ছে। প্রফেসর বিল ইয়ং, জন, জিম, ইঞ্জিনিয়ার রিচার্ড, শ্যারন এবং তারিক। শ্যারন এই সময়টাতে সাধারণত দৌড়াতে যায়। শরীরকে ঠিক রাখার জন্য তার চেষ্টার কোনো অন্ত নেই। আজ সেও আছে কাফেটারিয়াতে। সবাই যখন গাদা গাদা খাবার নিয়ে খেতে বসে, শ্যারনের প্লেটে থাকে ঘাস লতাপাতাজাতীয় কিছু সালাদ। এ নিয়ে তাকে নানারকম হাসি-তামাশা করা হয়, সে কখনো গা করে

www.banglabook.com

নি।

খেতে বসে কখনো জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনা হয় না, সব সময়ই কাউকে-না-কাউকে বদনাম করা হয়। আজ ধরা হয়েছে সায়েন্স ফ্যাকাল্টির ডীনকে। তাঁর সম্পর্কে রসালো গল্প করছে ইঞ্জিনিয়ার রিচার্ড। রিচার্ডের গল্প করার ভঙ্গিটি খুব ভালো, শুনে সবাই হেসে একেবারে কুটিকুটি হয়ে যাচ্ছে। প্রফেসর বিল খুব হাসছেন, কিন্তু গল্পে যোগ দিচ্ছেন না, সায়েন্স ফ্যাকাল্টির ডীন তাঁর অনেক দিনের সহকর্মী, বন্ধু।

বদনামে একটু ভাটা পড়তেই জন বলল, তারিকের দেশে যখন যুদ্ধ হয়েছিল, তখন তারিক কী গান গাইত তোমরা জান?

কী গান?

জন গান গাইবার ভঙ্গি করে উচ্চস্বরে বলল,

আমার পোঁদে আঙুল দিও না

তা হলে দাঁত ভেঙে ফেলব

প্রফেসর বিল ইয়ং না শোনার ভান করলেন। শ্যারন বলল, তুমি যে কী বাজে কথা বলতে পার জন! ইস!

তারিক খেতে খেতে বিষম খেয়ে বলল, তোমার একেবারে মাথা খারাপ জন! একেবারে মাথা খারাপ!

৬

ফরিদের ঘুম ভাঙল টেলিফোনের শব্দে। সস্তা টেলিফোন, তাই বাজেরকমের একটা শব্দ হয়, ফরিদ ধড়মড় করে উঠে বসে। ঘড়িতে সাতটাও বাজে নি, এত সকালে কে ফোন করেছে? হয় জরুরি কোনো কাজ, না হয় নিউ ইয়র্কের কোনো গরু, যে জানে না লস এঞ্জেলসের সময় তিন ঘন্টা পিছনে। নিউ ইয়র্কে যখন দশটা বাজে, তখন এখানে সকাল সাতটা। ফরিদ টেলিফোনটা হাতে নিয়ে যতদূর সম্ভব গলাটা স্বাভাবিক করে বলল, হ্যালো।

ফরিদ ভাই, ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম?

কেউ যদি আসলেই ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করে, ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম— তখন তার উত্তরে কী বলতে হয়? হ্যাঁ, ভাঙিয়ে দিয়েছ, এখন ভাগো?

ফরিদ যতদূর সম্ভব গলার বিরক্তিটা গোপন করে বলল, না, এই আর কি! আপনি কে কথা বলছেন?

আমি আশরাফ।

ও আচ্ছা, আশরাফ। কি খবর?

খবর বেশি ভালো না।

ফরিদ ভদ্রতা করে গলায় খানিকটা উৎকণ্ঠা ফোটানোর চেষ্টা করে বলল, কেন, কী হয়েছে?

টুকুকে মনে আছে?

টুকু?

হ্যাঁ, হান্নান সাহেবের শালা।

না, মানে—

মনে নেই, হান্নান সাহেবের বাসায় সেদিন ডিনারের সময় ডালের বাটি উল্টে ফেলে দিল?

ফরিদের ভাসা ভাসা মনে পড়ল, খাবার টেবিলে সেদিন সত্যি ডালের বাটি উল্টে গিয়েছিল। কে উল্টেছিল সেটা খেয়াল করে নি। আশরাফকে সেটা বলে লাভ নেই, অন্য আরেকটা ঘটনা মনে করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে। ফরিদ চেনার ভান করে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কী হয়েছে টুকুর?

সিকিউরিটি ধরেছে।

কিসের সিকিউরিটি?

সেফওয়ের। সেফওয়েতে কাজ করত।

কেন ধরেছে?

আশরাফ একটু আমতা-আমতা করে বলল, ইয়ে, বলছে সে নাকি ক্যাশ রেজিস্টার থেকে টাকা সরিয়েছে।

সত্যি?

সত্যি মিথ্যা তো জানি না ফরিদ ভাই। যেটা শুনেছি সেটা বললাম। আশরাফ গলায় একটা সমবেদনার সুর ফুটিয়ে বলল, সেদিন মাত্র দেশ থেকে এসেছে, এসেই কি রকম একটা ঝামেলায় পড়ল বলেন দেখি!

ফরিদের ঘুম পুরোপুরি চটে গেল এবারে। প্রায় খেঁকিয়ে উঠে বলল, ঝামেলায় পড়ল মানে? চুরি করার সময় মনে ছিল না? দেশ থেকে সব চোর-ছ্যাঁচড় এসে হাজির হয়েছে মনে হচ্ছে!

না না ফরিদ ভাই, কী বলছেন আপনি? সেফওয়ে পুরো কন্ট্রোল করে ইহুদিরা। মুসলমানদের দুই চোখে দেখতে পারে না। ইচ্ছে করে ঝামেলায় ফেলে দেয়—

ফরিদ মহা খাপ্পা হয়ে বলল, ঐ সব জামাতী ইসলাম মার্কা গপ্প আমার কাছে করো না। চুরি করার সময় মনে থাকে না, এখন দোষ ইহুদিদের?

আশরাফ দুর্বলভাবে একটু চেষ্টা করে। কিন্তু হাজার হলেও দেশের একটা ছেলে, এইভাবে সিকিউরিটি ধরে আটকে রেখেছে—

চুরি করলে ধরবে না কি মাথায় নিয়ে নাচবে?

কিন্তু ফরিদ ভাই, কিছু-একটা করা দরকার না? হাজার হলেও দেশের ছেলে!

কী করতে চাও?

কোনোভাবে যদি ছুটিয়ে আনা যায়।

আন।

কিন্তু—

কিন্তুটা কি?

আপনি যদি একটু সাহায্য করেন।

আমি? আমি কী করব?

একজন লোক দরকার, যে একটু ভালো কথাবার্তা বলতে পারে। শিক্ষিত মানুষ।

আমি ভালো কথাবার্তা বলতে পারি না। আর আমার থেকে অনেক বড় শিক্ষিত মানুষ আছে এদেশে।

থাকলেই তো হয় না—আশরাফ এবারে চাটুকারিতা শুরু করে, তারা তো ধরেন মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে না। আমাদের সাথে কথাবার্তা বলে সেরকম মানুষ আর কয়জন আছে?

কথাটি পুরোপুরি মিথ্যে নয়। স্থানীয় প্রতিষ্ঠিত বাঙালিরা মোটামুটিভাবে নিজেদেরকে নিজেদের মাঝে গুটিয়ে রাখেন। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষজনের সাথে তাদের বিশেষ যোগাযোগ নেই। বিজয় দিবস, একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানে, আপনি তুমি বাঁচিয়ে 'আজকাল কী করা হয়' এই ধরনের কথাবার্তা বলার চেষ্টা করেন। ফরিদ প্রতিষ্ঠিত বাঙালিদের মাঝে পড়ে না, কিন্তু ডক্টরেট করছে বলে শিক্ষিত অপবাদটি প্রায়ই শুনতে হয়। আশরাফ মধ্য লস এঞ্জেলসের একটি কুখ্যাত এলাকায় সেভেন ইলেভেন নামে মনোহারী দোকানে সময়ে অসময়ে কাজ করে। নানা কারণে ফরিদের সাথে তার খানিকটা যোগাযোগ আছে।

আশরাফ বলল, ফরিদ ভাই, কী বলেন আপনি?

ফরিদ বলল, আমি ওসবের মাঝে নেই। তোমাদের যা ইচ্ছা হয় কর।

ফরিদ ভাই, টুকুর কথা ছেড়ে দিলাম, হান্নান সাহেবের কথাটা ভেবে দেখেন। জানাজানি হলে কী হবে! রাজাকারের গুষ্টি যদি খবর পায়—

পাক। ফরিদ টেলিফোন রেখে দিল। টুকু নামক চরিত্রটির ক্যাশ রেজিস্টার থেকে টাকা সরিয়ে জেলে যাবার মানবিক দিকটি ছাড়াও একটি রাজনৈতিক দিকও আছে বলে মনে হচ্ছে। স্থানীয় বাঙালিদের মাঝে নানারকম দলাদলি আছে, আপাতত যে-দু'টি দল সবচেয়ে সক্রিয়, তারা একে অন্যকে যথাক্রমে রাজাকারের গুষ্টি এবং ইন্ডিয়ার দালাল বলে দাবি করে থাকে। আশরাফের কথা শুনে মনে হল টুকুর ভবিষ্যতের সাথে এই দলগুলির ভবিষ্যৎ কোনোভাবে খানিকটা জড়িত হয়ে আছে।

টেলিফোনটা রেখে ফরিদ খানিকক্ষণ চুপচাপ বিছানায় বসে থাকে। আশরাফ হচ্ছে এখানকার সবচেয়ে করিৎকর্মা মানুষগুলির একজন। পড়াশোনা বিশেষ নেই। জার্মানি হয়ে কীভাবে কীভাবে এদেশে চলে এসেছে সেটাও খানিকটা রহস্যের মতো। কাজ

করার অসম্ভব ক্ষমতা এবং মনে হয় ভালো দূরদৃষ্টি আছে। টুকু নামক চরিত্রটিকে ছুটিয়ে আনতে যাওয়ার জন্যে নিজে চলে না গিয়ে লেখাপড়া জানা একজন চকচকে মানুষকে নিয়ে যাবার কথাটি যে সে ভেবেছে, সেটাই তার একটা প্রমাণ।

টুকু নামক চরিত্রটির জন্যে ফরিদের কোনো সহানুভূতি নেই, কিন্তু আশরাফকে সে বেশ পছন্দই করে। তাকে এভাবে নিরাশ করতে একটু খারাপ লাগে। খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে সে আশরাফকে আবার টেলিফোন করল। আশা করছিল সে বের হয়ে যাবে বলে তাকে বাসায় পাবে না, কিন্তু আশরাফকে বাসাতেই পাওয়া গেল। ফরিদ বলল, আশরাফ, আমি ফরিদ।

ফরিদ ভাই, কি ব্যাপার?

টুকুকে ধরে রেখেছে জায়গাটা কোথায়?

আপনি যাবেন ফরিদ ভাই? যাবেন?

তুমি এরকম করে বলছ, তাই। ঐ চোর-ছ্যাঁচড়ের জন্যে আমার কোনো মায়াদয়া নেই।

আমি জানতাম আপনি যাবেন। আগে একটু রাগ হয়ে চেঁচামেচি করে তারপর রাজি হবেন। হাঃ হাঃ হাঃ। সেই জন্যে টেলিফোনের কাছে বসে আছি!

এখন বল কোথায় যেতে হবে।

আপনি চিনবেন না। আমি যেখানে কাজ করি তার কাছে। আমি এসে আপনাকে নিয়ে যাব।

একেবারে উল্টো দিকে আসতে হবে তোমার। আমাকে বলে দাও, আমি চলে আসব।

কষ্ট হবে আপনার।

কষ্ট না আশরাফ, এটার নাম যন্ত্রণা।

হাঃ হাঃ হাঃ—আশরাফ হাসতে হাসতে বলে, আপনি যে কী মজার কথা বলেন! এইটা হচ্ছে যন্ত্রণা!

টুকুর কি কাগজপত্র ঠিক আছে?

ইয়ে—মানে—কাগজপত্র তো বুঝতেই পারেন! ফ্লোরিডার কেস আর কি!

তার মানে, নেই?

হয়ে যাবে বলেছে লয়ার। খুব ভালো একটা মেক্সিকোর লয়ার আছে।

এখন তো নেই?

না।

ফরিদ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ঠিক আছে, বল কোথায় যেতে হবে।

আশরাফ ফরিদকে জায়গাটা চিনিয়ে দিল। মধ্য লস এঞ্জেলসের মোটামুটি ভদ্র এলাকায় একটা বড় সুপার মার্কেট। সামনে বড় পার্কিং লট, আশরাফ সেখানে

ফরিদের জন্যে অপেক্ষা করবে। ফোন রেখে দেয়ার আগে বলল, ফরিদ ভাই, আরেকটা কথা।

কি কথা?

টুকু যে-টাকা সরিয়েছে, বলেছে সেই টাকা ফেরত দিতে হবে। বুঝতেই পারছেন অনেকগুলি টাকা।

তা হলে?

টাকাটা তোলার চেষ্টা করছি।

তুমি কেন তোলার চেষ্টা করছ? হান্নান সাহেবের শালা, হান্নান সাহেবকে বল।

হান্নান সাহেব মানে, ইয়ে— টুকুর সাথে একটু গোলমালের মতো। তাই— আশরাফ আমতা-আমতা করে থেমে গেল।

যার শালা তার গরজ নেই, আর তুমি তোমার জান দিয়ে দিচ্ছ?

হাজার হলেও একটা দেশের ছেলে! টাকাটা প্রায় উঠে গেছে। আর একটু হলেই হয়ে যায়। আপনি যদি কিছু দেন।

ফরিদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কত?

কুড়ি ডলার।

কুড়ি ডলার! ফরিদের মেজাজটা আবার খারাপ হয়ে গেল। শুধু যে একটি সকাল মাটি হল তাই নয়, সাথে কুড়িটি ডলার। কুড়ি ডলার তার জন্যে অনেক টাকা। পুরো মাসের পেট্রল খরচ হয়ে যায় গাড়ির।

পার্কিং লটে দু'টি গাড়িতে তিন জন বসে আছে। বাঙালিরা বিদেশে এলে সম্ভবত তুলনামূলকভাবে বেশি গোঁফ রাখে। দেখা যাচ্ছে এখানে যারা এসেছে তাদের সবারই নাকের নিচে অল্পবিস্তর গোঁফ। ফরিদ এদের মাঝে শুধু আশরাফকে চেনে, অন্যদের আগে কখনো দেখে নি।

ফরিদকে দেখে আশরাফ এগিয়ে এল। অন্য দু' জন গাড়িতে বসে বসে কেমন জানি সন্দেহের চোখে ফরিদকে লক্ষ করতে থাকে। আশরাফ বলল, ফরিদ ভাই, এসেছেন? অসুবিধা হয় নি তো কিছু?

না।

আশরাফ অন্য দু' জনের সাথে ফরিদের পরিচয় করিয়ে দেয়ার কোনো চেষ্টা করল না। সামাজিকতার এইসব ছোটখাটো জিনিস আশরাফ বা আশরাফের মতো মানুষজন এখনো পুরোপুরি শেখে নি। আশরাফ গলা নামিয়ে বলল, টাকাটা মোটামুটি জোগাড় হয়েছে।

এটি ফরিদকে তার টাকাটা দেয়ার কথা মনে করিয়ে দেবার একটা ইঙ্গিত। ফরিদ পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে একটা বিশ ডলারের নোট বের করে দেয়। ফরিদ মুখ কাঁচুমাচু করে। নোটটি হাতে নিয়ে পকেট থেকে নোটের একটা বাণ্ডিল

বের করে সেখানে রেখে দিয়ে বলে, আপনার উপর কত রকম অত্যাচার!

সত্যি সত্যি অত্যাচার করে কেউ যদি বলে 'আপনার উপর কত রকম অত্যাচার', তা হলে কী বলা যায়? ফরিদ কিছু বলল না।

আশরাফ বলল, চলেন ভিতরে যাই।

চল। হাঁটতে হাঁটতে বলল, টুকুর ভালো নামটা কি?

সৈয়দএমদাদউদ্দিন।

সৈয়দএমদাদউদ্দিন?

জ্বি।

ভিতরে গিয়ে কী বলব?

সেটা আপনার বিবেচনা।

ফরিদের বিবেচনার উপর এর আগে কেউ এত বড় আস্থা প্রকাশ করেছে বলে তার মনে পড়ল না।

সেফওয়েটি চব্বিশ ঘন্টা খোলা থাকে। এখনো বেলা হয় নি বলে লোকজনের ভিড় বলতে গেলে নেই। গোটা দশেক চেক আউট কাউন্টারের মাঝে মাত্র দু'টি খোলা। সেফওয়েয়ের কিছু মানুষ দিনের প্রস্তুতি হিসেবে বড় বড় বাক্স খুলে শেলফে শেলফে জিনিস রাখা শুরু করেছে। ফরিদ কাকে কি জিজ্ঞেস করবে ঠিক বুঝতে পারল না। বড় একটা কার্ট নিয়ে একজন এগিয়ে যাচ্ছিল, ফরিদ ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের সিকিউরিটির লোকটি কোথায়? তার সাথে একটু কথা বলতে পারি?

লোকটি তাদের দিকে না তাকিয়েই গলা উঁচিয়ে কাউন্টারের মেয়েটিকে ডেকে বলল, লিসা, মার্ককে একটু ডেকে দাও তো!

লিসা নামে কালো, মোটা এবং নির্জীব একটা মেয়ে খুব ধীরে ধীরে ফোনটা তুলে পেজিং সিস্টেমে বলল, মার্ক কাউন্টার নাম্বার সাত। মার্ক কাউন্টার নাম্বার সাত।

প্রায় সাথে সাথেই সেফওয়েয়ের ঘরের কোণা থেকে সোনালি চুলের একজন মানুষকে হনহন করে হেঁটে আসতে দেখা গেল। পুরুষমানুষের সোনালি চুল হলে তাকে কেমন জানি উদ্ধত এবং নিষ্ঠুর মনে হয়, এই লোকটির চেহারাতেও কেমন জানি একটা আলগা কাঠিন্য রয়েছে; এর সাথে নিজের দেশের একজন চোরের পক্ষ হয়ে কথাবার্তা বলতে হবে ভেবে ফরিদ কেমন জানি বিপন্ন অনুভব করে।

সোনালি চুলের মানুষটি, যার নাম মার্ক, ফরিদ এবং আশরাফকে দেখে বুঝে গেল তারা কেন এসেছে। ভদ্রতার কোনোরকম চেষ্টা না করে সোজাসুজি বলে বসল, তোমরা ক্যাশ রেজিস্টারের টাকা-চোরের জন্যে এসেছ?

ফরিদের মাথার মাঝে ক্রোধের একটা ছোট বিস্ফোরণ হল সাথে সাথে, অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করে ফরিদ, আশরাফ অনেক আশা করে তাকে ধরে এনেছে, রাগ করার সময় এটা নয়। মার্কের চোখের দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বলল, অপরাধ

প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত সবাই নির্দোষ। অপরাধ প্রমাণ হয় কোর্টে, এই ব্যাপারটা এখনো কোর্টে যায় নি।

সোনালি চুলের মানুষটি থতমত খেয়ে গেল, ঠিক এরকম বইয়ের ভাষার একটি উত্তর সে মোটেও আশা করে নি। ফরিদ এবারে নিজের হাত এগিয়ে দিয়ে বলে, আমার নাম ডক্টর ফরিদ। কথাটি সত্যি নয়, সে পিএইচ. ডি. করছে, এখনো শেষ হয় নি— কিন্তু এখানে এইসব খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই।

সিকিউরিটির মানুষটি খুব অনিচ্ছার সাথে হাত মিলিয়ে বলল, আমার নাম মার্ক জিজিন্সকি।

ফরিদ আশরাফকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, মিঃ জিজিন্সকি, তোমার সাথে কি আমি কিছুক্ষণ কথা বলতে পারি?

হ্যাঁ।

কোথায় কথা বলব?

মার্ক আবার অনিচ্ছার সাথে বলল, এস আমার সাথে।

সুপার মার্কেটের এক কোণায় ছোট একটা ঘর, সেখানে কোনোমতে একটা টেবিল পেতে রাখা হয়েছে। দুই পাশে কিছু লোহার ফোল্ডিং চেয়ার। ফরিদ এবং আশরাফ দু'টি চেয়ার টেনে বসে। মার্ক তাদের সামনে বসে মুখ শক্ত করে বলল, তোমাদের কেমন করে সাহায্য করতে পারি?

আমি যতদূর জানি, মিস্টার সৈয়দ এমদাদউদ্দিন গত রাতে সেফওয়ে থেকে বাসায় ফিরে যায় নি। আমি জানতে চাইছিলাম সে কোথায় আছে, কেমন আছে।

সেইদ ক্যাশ রেজিস্টার থেকে টাকা সরিয়েছে—

ফরিদ বাধা দিয়ে বলল, আমি সেটা নিয়ে কথা বলতে চাই না। সৈয়দ এমদাদউদ্দিন আসলেই ক্যাশ রেজিস্টার থেকে টাকা সরিয়েছিল কি না সেটা বের করার জন্য পুলিশ আছে, কোর্ট আছে। আমি জানতে চাইছি সে কোথায়—

এখানে আছে।

এখানে কোথায়?

পাশে একটা ঘরে।

ফরিদ অবাক হওয়ার ভান করে বলল, ঘরে আটকে রেখেছ?

হ্যাঁ।

তাকে—তাকে কোনোরকম অত্যাচার করা হয় নি তো?

অত্যাচার! অত্যাচার কেন করব?

না, মানে কিছুদিন আগে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল কিনা, তাই। মনে নেই— সাউথ সেন্ট্রালের একটা কে-মার্টে আমাদের একজনকে মেরে ফেলল? সে নাকি কে-মার্টের জিনিস সরিয়েছিল, খুব অত্যাচার করে মেরেছে। শরীরে সিগেরেটের পোড়া

দাগ পাওয়া গিয়েছিল, ইলেকট্রিক শক। এ ধরনের নানারকম অত্যাচার। মনে নেই?

মার্ক জিনিস্কি মাথা নাড়ল, তার মনে নেই। মনে থাকার কথা নয়, কারণ ব্যাপারটি কখনো ঘটে নি।

ফরিদ গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলল, খুব হৈচৈ হল ব্যাপারটা নিয়ে। আমাদের কমিউনিটি খুব হৈচৈ করেছিল। তুমি তো জান আমাদের কমিউনিটি বিশাল কমিউনিটি।

মার্ক ভুরু কুঁচকে ফরিদের দিকে তাকিয়ে থাকে। ফরিদ আবার বলে, শুধু যে বিশাল কমিউনিটি তাই নয়, আমাদের এই ইন্ডিয়ান কমিউনিটি অত্যন্ত একতাবদ্ধ কমিউনিটি।

ফরিদ একসাথে দু'টি মিথ্যে কথা বলল। প্রথমত সে ভারতবর্ষের মানুষ নয়, সে বাংলাদেশের। দ্বিতীয়ত বাংলাদেশের সম্প্রদায় মোটেও একতাবদ্ধ নয়, তাদের ভিতরকার দলাদলি আজকাল শিল্প পর্যায়ে পৌছে গেছে। নিজেকে ভারতবর্ষের মানুষ হিসেবে দাবি করার অবশ্যি অন্য কারণও আছে, এতে টাকা চুরির অপরাধটি একজন ভারতীয়ের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হল। তা ছাড়া বাংলাদেশ এদের কাছে মোটামুটি একটি অপরিচিত দেশ। সে তুলনায় ভারতবর্ষকে চট করে চিনে নেয়। নিজেদের এখন ভারতবর্ষের বলে পরিচয় দিয়ে একতাবদ্ধ হিসেবে দাবি করলে বেশ জোর দিয়ে কথা বলা যায়।

মার্ক মানুষটি মনে হচ্ছে একটু ত্যাঁদড়গোছের, শক্ত মুখ করে বসে রইল। ফরিদ আবার বলল, কে-মার্টের সেই দুর্ঘটনার পর থেকে আমরা খুব সচেতন। এ ধরনের ব্যাপার আমরা আর সহ্য করব না। আমেরিকা যেরকম তোমার দেশ, সেরকম আমাদেরও দেশ। তোমাদের যেমন অধিকার, আমাদেরও সেরকম অধিকার। তা ছাড়া ভারতীয় সম্প্রদায় এখন একটা শক্তিশালী জনশক্তি। আমরা যে- কংগ্রেসম্যানকে সমর্থন করি, সে চোখ বুজে ইলেকশানে উঠে আসে। আশা করি হঠাৎ করে এমন কিছু করা হবে না, যেটি এই বিশাল ভারতীয় সম্প্রদায়কে কোনোভাবে বিচলিত করবে।

মার্ক আস্তে আস্তে টেবিলে ঠোকা দিতে দিতে বাঁকা করে হেসে বলল, সেইদ ক্যাশ বাক্স থেকে টাকা সরিয়েছে—

সে যদি সত্যি এটা করে থাকে তা হলে তার জন্যে অবশ্যি তাকে শাস্তি পেতে হবে। অবশ্যি অবশ্যি পেতে হবে— ফরিদ টেবিলে একটা থাবা দিয়ে বলল, কিন্তু সেই শাস্তি দেবে এই দেশের আইন। তুমি তো তাকে শাস্তি দিতে পারবে না। তুমি সৈয়দ এমদাদউদ্দিনকে সারা রাত আটকে রেখে তার সাংবিধানিক অধিকারকে ক্ষুণ্ন করেছ। ফরিদ তার মুখে গভীর দুঃখের একটা ভাব ফুটিয়ে মাথা নাড়ে।

মার্ককে এই প্রথম বার একটু বিচলিত হতে দেখা গেল। বলল, কিন্তু সে নিজে স্বীকার করেছে। নিজে বলেছে—

বলুক। তাতে কিছু আসে যায় না। তাকে সাথে সাথে পুলিশের হাতে দেয়া উচিত ছিল। তাকে পুলিশের হাতে না দিয়ে নিজে আটকে রেখে তার সংবিধানিক অধিকার তুমি ক্ষুণ্ন করেছ। সৈয়দ ব্যক্তিগতভাবে হয়তো একজন চতুর্থ শ্রেণীর অপরাধী, কিন্তু

যতক্ষণ তার অপরাধ প্রমাণিত না হচ্ছে, তাকে তার প্রাপ্য সম্মান দিতে হবে। ফরিদ হঠাৎ গলার স্বর পাল্টে অনেকটা অন্তরঙ্গ সুরে জিজ্ঞেস করল, তোমরা সৈয়দকে নিয়ে কী করবে বলে ঠিক করেছ?

মার্ক খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তোমরা তার কী হও?

আমরা একই সম্প্রদায়ের মানুষ, সে হিসেবে এসেছি।

মার্ক ফরিদের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, সেইদ অনেকদিন থেকে টাকা সরাচ্ছে। হিসেব করে দেখা গেছে প্রায় সাড়ে তিন হাজারের উপরে। টাকাটা ফেরত দেওয়া হলে ছেড়ে দেব। না হলে প্রসিকিউট করা হবে।

আশরাফ ফিসফিস করে বাংলায় বলল, সাড়ে তিন হাজার? আমি তো শুনেছিলাম সাত শ'।

তোমার কাছে কত আছে?

টেনেটুনে সাড়ে সাত শ'। তখন তো তাই বলল।

ফরিদ মার্কের দিকে তাকিয়ে বলল, সাড়ে তিন হাজার ডলার আমাদের কাছে নেই।

দুই ঘন্টা সময় দিচ্ছি, নিয়ে এস।

দুই ঘন্টা কেন, দুই বছর সময় দিলেও হবে না। আমাদের কমিউনিটি একটা সম্মানজনক কমিউনিটি। আমরা বড় বড় কাজে ফান্ড রেইজিং করেছি। গত বছর এখানকার ডায়াবেটিক সোসাইটিকে আমরা দশ হাজার ডলার তুলে দিয়েছি। চতুর্থ শ্রেণীর একটা অপরাধীর জন্যে তো আমরা ফান্ড রেইজিং করতে পারি না। কেউ এর জন্যে একটি পেনিও দেবে না। আমরা ন্যায়বিচারে বিশ্বাস করি।

মার্ককে এবারে একটু বিভ্রান্ত দেখা গেল, ভুরু কুঁচকে বলল, কী বলছ তাহলে?

আমাদের কাছে এখন পাঁচ শ' ডলার আছে, তোমাদের দিই। তোমরা সৈয়দকে ছেড়ে দাও।

পাঁচ শ' ডলার! তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

কেন? ক্ষতি কি? কোনো তো প্রমাণ নেই যে সে সত্যি সাড়ে তিন হাজার ডলার সরিয়েছে। আমাদের এত টাকা নেই। পাঁচ শ' ডলার দিই, ছেড়ে দাও। এখনি দিতে পারি–সাথেই আছে।

না।

দেখ, সৈয়দ এই লাইনে নূতন। তাকে ছেড়ে দিলে আমরা হয়তো বুঝিয়ে তাকে ঠিক করে দিতে পারব। যদি প্রসিকিউট কর, আমি লিখে দিতে পারি ঘাঘু ক্রিমিন্যাল হয়ে বের হয়ে আসবে। ছেড়ে দাও।

না।

শেষবার বলছি। পাঁচ শ' ডলার দিই।

মার্ক জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, কিছুতেই না। সাড়ে তিন হাজার ডলারের

এক পেনিও কম নয়।

ফরিদ তখন উঠে দাঁড়াল। গলার স্বরে খানিকটা হতাশা ফুটিয়ে বলল, ঠিক আছে তা হলে, তোমার যা ইচ্ছা।

আশরাফ ফরিদের হাত খামচে ধরে বলল, ফরিদ ভাই—

ফরিদ হাত সরিয়ে বাংলায় বলল, দাঁড়াও তুমি। তারপর মার্কের দিকে ঘুরে বলল, আমি কি সৈয়দের সাথে একটু দেখা করতে পারি?

কেন?

দেখতে চাই তাকে শারীরিকভাবে কোনো যন্ত্রণা দেয়া হয়েছে কি না। তোমরা যদি ব্যাপারটা কোর্টেই নিষ্পত্তি করতে চাও, তার একটা সাক্ষী থাকা ভালো। টর্চার করেছ কি না—

মার্ক ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, টর্চার?

হ্যাঁ। কে-মার্টের মার্ডার কেসে দেখা গিয়েছে সারা রাত টর্চার করেছিল। সিগারেটের ছ্যাঁকা থেকে শুরু করে ইলেকট্রিক শক। ভয়াবহ ব্যাপার!

এখানে কোনো টর্চার হয় নি।

সেটা তোমার মুখের কথা। আমি সৈয়দের মুখের কথাও শুনতে চাই। কে সত্যি কথা বলছে সেটা কোর্ট যাচাই করবে।

মার্কের মুখে একটা ক্রোধের ছায়া পড়তে থাকে। ফরিদ গম্ভীর গলায় বলল, একজন মানুষকে সারা রাত খেতে না দিয়ে আটকে রাখাও এক ধরনের টর্চার। রাতে খেতে দিয়েছ কিছু?

সারা রাত এমনিতেই কাজ করার কথা। খাওয়ার প্রশ্ন আসছে কেন?

তুমি তাই মনে কর। কোর্ট অন্য রকম মনে করতে পারে।

মার্কের মুখ রাগে আস্তে আস্তে লাল হয়ে ওঠে। একদৃষ্টে ফরিদের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি আমার সাথে নোংরা চাল চালার চেষ্টা করছ?

না, এটা নোংরা চাল না। তুমি তোমার ইন্টারেস্ট রক্ষা করবে, আমি আমার কমিউনিটির মানুষের ইন্টারেস্ট রক্ষা করব। আমার কথা শোন। পাঁচ শ' ডলার দিই, তাকে ছেড়ে দাও। কারো কোনো ঝামেলা হবে না।

না! সাড়ে তিন হাজার ডলারের এক পেনি কম নয়।

ঠিক আছে। ফরিদ হঠাৎ মনে পড়েছে সেরকম ভান করে বলল, তুমি তো জান, সৈয়দ বেআইনিভাবে এদেশে আছে। গ্রীন কার্ড নেই। তার কাজ করার কোনো কাগজপত্র নেই।

মার্ক অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ফরিদের দিকে তাকাল। ফরিদ মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ। আমার কথা বিশ্বাস না হয় খোঁজ নিয়ে আস। আমি অপেক্ষা করছি এখানে।

সে তা হলে কেমন করে কাজ করছে এখানে?

আমি জানি না, তুমি বল আমাকে। কেউ নিশ্চয়ই কাগজপত্র না দেখে কাজ দিয়েছে। কোর্টে যখন কেস উঠবে, যদি কোনোভাবে ইমিগ্রেশান খোঁজ পায়, তোমাদের বড় ঝামেলা হয়ে যাবে। তুমি তো এখন সাড়ে তিন হাজার ডলার চাইছ, সেখানে চোখ বুজে দশ হাজার ডলার ফাইন হয়ে যাবে। নাকি আরো বেশি?

মার্ক খানিকক্ষণ অবাক হয়ে ফরিদের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর হঠাৎ কেমন জানি ক্ষেপে উঠল। প্রথম কিছুক্ষণ রাগে কোনো কথাই বলতে পারল না। তারপর পা দাপিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে টেবিলে ঘুষি মেরে বলল, পাঁচ শ' ডলার রেখে এই গুহ্যদ্বারকে নিয়ে এই মুহূর্তে বিদায় হও। এই মুহূর্তে— এই মুহূর্তে—

ফরিদ শান্ত স্বরে বলল, মেজাজ খারাপ করে লাভ নেই মিঃ জিজিঙ্গকি। আমাকে একটা রিসিট দিতে হবে।

মার্ক অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ফরিদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

গাড়িতে ফরিদের পাশে টুকু বসে আছে। সেফওয়ে থেকে টুকুকে বের করে আনার পর ফরিদ নিজেই তাকে বাসায় পৌঁছে দেবার কথা বলেছে। আশরাফের কাজে যাবার সময় হয়ে গেছে, অন্য দু' জন টুকুর সাথে ভালো করে কথা পর্যন্ত বলতে রাজি নয়। ফরিদের ইচ্ছে ছিল গাড়ি করে নেবার সময় এই চরিত্রটিকে একটি শক্ত শিক্ষা দেয়ার, যেন এই জীবনে দ্বিতীয়বার এ ধরনের কাজ না করে। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল ব্যাপারটি এত সহজ নয়। টুকুর প্রায় ছেলেমানুষি চেহারা, একমাথা কোঁকড়া চুল, টকটকে ফর্সা গায়ের রং, বড় বড় উজ্জ্বল চোখ, মায়াকাড়া চোহারা দেখলে কে বলবে সে ক্যাশ রেজিস্টার থেকে নিয়মিত টাকা সরিয়ে আসছে!

শহরের ব্যস্ত রাস্তায় যতক্ষণ ছিল, ফরিদ কোনো কথা বলল না। ফ্রী ওয়েতে উঠে বলল, তুমি কেমন করে এরকম একটা কাজ করলে?

টুকু আহত স্বরে বলল, আপনি তাই ভাবছেন যে আমি ওটা করেছি?

কর নি?

বিশ্বাস করেন আমি করি নি।

তা হলে?

আপনি তো জানেন আমার কাগজপত্র ঠিক নেই। মেক্সিকান একটা লোক আছে, নাম আলবার্তো, আমার কাছ থেকে তিন শ' ডলার নিয়ে আমাকে কাজ দিয়েছে। সেই ব্যাটা ঠিক যখন আমার ডিউটি পড়ে, ক্যাশ রেজিস্টার থেকে টাকা সরিয়ে ফেলে।

তুমি সরাতে দিলে কেন?

আমি কি এতসব জানি? নূতন এসেছি, কিছু বুঝি না আমি। যখন টের পেয়েছি, ঠিক করেছি কমপ্লেন করব, বদমাইসটা বলে আমাকে চাকরি থেকে বের করে দেবে। বলে দেবে কাগজপত্র নেই। বুঝতেই পারছেন নূতন দেশ থেকে এসেছি, হাতে একটা পয়সা নেই।

এভাবে এলে কেন?

কী করব ফরিদ ভাই? ইন্টারমিডিয়েটের আগে শরীর খারাপ হল, রেজাল্ট একেবারে যা–তা। ইঞ্জিনিয়ারিং মেডিক্যাল কোথাও চান্স পাই না। আপা বললেন, আমেরিকা আসবি নাকি? আমি ভাবলাম আমেরিকা না জানি কী দেশ! এসে কী ঝামেলাতেই না পড়েছি! এই দেশে মানুষ থাকে কেমন করে ভাই?

সবাই তো আছে। অসুবিধে কোথায়? তোমার মতো ঝামেলাতে তো কেউ পড়ছে না। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা শিখতে হবে না?

তাই তো শিখছি ভাই। প্রথম শিক্ষা হল আমার, সেটা হচ্ছে, কোনো মানুষকে বিশ্বাস করতে নেই। তবে সেটা শেখার জন্যে অনেক মূল্য দিতে হল। কী একটা লজ্জার ব্যাপার হল বলেন দেখি! কেউ যদি শোনে, ভাববে সত্যি আমি টাকা চুরি করেছি। টুকু ছেলেমানুষের মতো কেঁদে ফেলল হঠাৎ, বলল, দেশে মা যদি খবর পায় একেবারে মরে যাবে মা। একেবারে মরে যাবে।

ফরিদ বলল, আরে কাঁদার কী আছে এর জন্যে? তুমি নিজে যদি খাঁটি মানুষ হও কে কি বলল, তাতে কী আসে যায়?

টুকুকে তার বোনের বাসায় নামিয়ে সোজা ইউনিভার্সিটি চলে যাবে ফরিদ, তাই রাস্তায় নিজের অ্যাপার্টমেন্টে থেমে গেল ফরিদ। চা খাবে নাকি জিজ্ঞেস করল টুকুকে, সে খুব আগ্রহ নিয়ে রাজি হল। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হল ছেলেটা ক্ষুধার্ত। ফরিদ তাই ফ্রীজ থেকে খাবার বের করে দিল, রাতের রান্না করা। কিমা এবং ঠাণ্ডা কড়কড়ে ভাত। একটু গরম করে দিতে চাইছিল ফরিদ, টুকু বলল, কোনো প্রয়োজন নেই, ঠাণ্ডা ভাত জমে থাকা কিমার তরকারি দিয়ে বুভুক্ষুর মতো খেল টুকু। দেখে মনে হল বেচারা কতদিন থেকে না খেয়ে আছে।

এই ফাঁকে ফরিদ চট করে গোসলটা সেরে নিল। ভোরে ঘুম থেকে উঠে গোসল না করা পর্যন্ত তার নিজেকে কেমন জানি নির্জীবের মতো মনে হয়।

টুকুকে তার বোনের বাসায় নামিয়ে ইউনিভার্সিটি যেতে যেতে বেলা বারটা বেজে গেল ফরিদের।

দুপুরে কাফেটারিয়ায় খেতে গিয়ে ফরিদ আরো একটা জিনিস আবিষ্কার করল— তার মানিব্যাগে একটি পয়সাও নেই। কেউ–একজন যত্ন করে তার মানিব্যাগ থেকে শেষ ডলারটিও সরিয়ে নিয়েছে। সকালে গোসল করার সময় মানিব্যাগটি টেবিলের উপর রেখে গিয়েছিল।

টুকুর সামনে।

৭

কাস্টমসের বন্ধ দরজার সামনে সবাই ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। ভিতর থেকে ফ্লাইট নাম্বার দুই শ' তিনের লোকজন একে একে বের হয়ে আসছে। সরকার স্যারের এই

ফ্লাইটে আসার কথা। ঠিকমতো প্লেনে উঠেছেন কি না জানার কোনো উপায় নেই। সেই কোন গ্রামের স্কুলের শিক্ষক, কথা নেই বার্তা নেই আমেরিকার লস এঞ্জেলসের মতো শহরে চলে আসছেন—তারিক মনে মনে খুব দুশ্চিন্তা অনুভব করে। সে দীর্ঘদিন থেকে এদেশে আছে, অনেকবার কাজেকর্মে নানা দেশে গিয়েছে, কিন্তু এখানো নূতন দেশে নূতন এয়ারপোর্টে কাস্টমস ইমিগ্রিশানের ভিতর দিয়ে যেতে তার অশান্তির শেষ থাকে না। সরকার স্যার কীভাবে পুরো ব্যাপারটা সামলে নেবেন সে ভেবে পায় না।

এক জন এক জন করে মানুষ অতিকায় স্যুটকেস ঠেলতে ঠেলতে বের হয়ে আসছে। সরকার স্যারের কোনো দেখা নেই। তারিক যখন প্রায় হাল ছেড়ে দিচ্ছিল, ঠিক তখন সরকার স্যার বের হয়ে এলেন। পরনে স্যুট এবং যে-কোনো মানুষ দেখলে বুঝতে পারবে এই মানুষটির স্যুট পরে অভ্যাস নেই। শুধু যে আড়ষ্ট একটা চেহারা তাই নয়, মাথায় একটি টুপি এবং গলায় উজ্জ্বল সবুজ রংয়ের মাফলারে তাঁকে দেখতে খানিকটা পাগল এবং খানিকটা বেশ্যার দালালের মতো দেখাচ্ছে। সরকার স্যার বের হয়ে এসে ভীত চোখে চারদিকে তাকাচ্ছেন, চারদিকে মানুষের ভিড়। কোথায় কোনদিকে যাবেন বুঝতে পারছেন না। চোখেমুখে স্পষ্ট আতঙ্ক, ঘন ঘন ঢোক গিলছেন, দেখে মনে হয় কেঁদে ফেলবেন যে-কোনো মুহূর্তে।

তারিক প্রায় দৌড়ে গিয়ে ডাকল, সরকার স্যার!

সরকার স্যার যেন অকূলে কূল পেলেন, জাপটে তারিকের হাত ধরে ফেললেন, বললেন, বাবা তারিক, এসেছিস তুই, এসেছিস!

এরকম সময়ে স্কুলের স্যারদের পা ছুঁয়ে সালাম করলে তাঁরা খুব খুশি হন, কিন্তু তারিক তার চেষ্টা করল না। ভয়ংকর ভিড় এখানে, নিচু হয়ে বসলে মানুষের ধাক্কায় ছিটকে পড়বে কোথাও। জিজ্ঞেস করল, পথে কোনো অসুবিধে হয় নি তো স্যার?

হয় নি আবার! কী বলিস তুই? আরেকটু হলে লাইরেরিয়া না সাইবেরিয়া চলে যেতাম। ওহ্ খোদা! কী বাঁচাটাই না বেঁচেছি! খোদা ভরসা! পৌঁছে তো গেলাম! সরকার স্যার যুদ্ধজয়ের ভঙ্গি করে তারিকের দিকে তাকালেন।

আর কোনো চিন্তা করবেন না স্যার।

না। আর কোনো চিন্তা নাই। সরকার স্যার এবার তারিকের দিকে ভালো করে তাকালেন, বললেন, তোর কী খবর বাবা? শরীরটা ভালো? এই বিদেশে থেকেও শরীরটা এত শুকনা? খালি দেখি কয়টা হাড্ডি!

কী বলেন স্যার! ওজন অন্তত দশ পাউন্ড বেড়েছে। আপনার শরীর কেমন?

এই বয়সে যেরকম থাকে। বেঁচে আছি আল্লাহ্‌র দোয়ায়।

চলেন স্যার যাই।

চল্ বাবা।

তারিক স্যারের স্যুটকেসটা তুলে নিল। স্যার বাধা দিতে গিয়ে থেমে গেলেন, সম্ভবত তাঁর মনে পড়ল, এদেশে মালপত্র নিজেদের টানাটানি করতে হয়।

লস এঞ্জেলস এয়ারপোর্টের রাস্তাঘাট ভালো নয়। সাধারণত সব বড় এয়ারপোর্টেই সরাসরি ফ্রী ওয়ে দিয়ে ঢুকে যাওয়া যায়। এই এয়ারপোর্টে সে ব্যবস্থা নেই। শহরের রাস্তাঘাট দিয়ে বেশ খানিক দূর গিয়ে তারপর ফ্রী ওয়েতে উঠতে হয়। এই এলাকাটি ভালো নয়, খুব কাছেই রয়েছে ইংগলউড শহরতলি। তার আশেপাশে অনেক জায়গায় আদিম জগতের বর্বরতা পুরোদমে রাজত্ব করছে। তারিক তাই ফ্রী ওয়েতে না ওঠা পর্যন্ত স্বস্তি বোধ করে না, খুব সাবধানে রাস্তাঘাটের সাইন দেখে এগুতে থাকে।

সামনে রাস্তা দু' ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, উপরে লেখা কোন দিকে যেতে হবে। তারিক পড়তে চেষ্টা করছিল, ঠিক তখন সরকার স্যার জিজ্ঞেস করলেন, এই শহরে কত মানুষ থাকে রে?

তারিক সাইনটি পড়তে পারল না। মানুষের মস্তিষ্ক নিশ্চয়ই একসাথে দু'টি কাজ করতে পারে না। স্যারের প্রশ্নটি মুহূর্তের জন্যে তারিকের মনোযোগ সরিয়ে নিয়েছিল বলে সাইনবোর্ডটি দেখেও সেখানে কী লেখা আছে পড়তে পারল না, সাইনবোর্ডটি পার হয়ে এল তারিক। স্যার আবার জিজ্ঞেস করলেন, কত লোক থাকে রে?

এই তের-চোদ্দ মিলিওনের মতো।

তারিক আবার চোখ খোলা রাখে, এই এলাকায় রাস্তাঘাট খুব ভালো করে চিহ্নিত করা আছে, সামনে নিশ্চয়ই আবার দেখা যাবে।

সত্যি আবার দেখা গেল, তারিক যে ফ্রী ওয়েটি নেবে সেটি এসে গেছে। যারা উত্তরে যাবে তারা বাম দিকে, যারা দক্ষিণে যাবে তারা ডান দিকে। কোনো-এক অজ্ঞাত কারণে তারিক উত্তর ও দক্ষিণ সব সময়ে গুলিয়ে ফেলে, চোখ বন্ধ করে পুরো এলাকাটি কল্পনা করে তাকে বের করতে হয় সে উত্তরে যাবে না দক্ষিণে যাবে। তারিক যখন ভেবে বের করার চেষ্টা করছিল, সরকার স্যার আবার জিজ্ঞেস করলেন, এক মিলিওন মানে কত রে?

তারিকের সবকিছু গোলমাল হয়ে গেল, বলল, এক সেকেণ্ড স্যার।

কী হয়েছে?

আমি রাস্তাটা নিয়ে নিই।

নে বাবা, নে।

তারিক আবার ভুল করে ফেলল, যে-রাস্তাটি নেয়ার কথা সেটি নিতে পারল না। গাড়ি ঘুরিয়ে নেয়ার উপায় নেই, কাজেই সোজা সামনে চলে যেতে হল। বেশ খানিকটা এগিয়ে তারিক গাড়িটা ঘুরিয়ে নেবার জন্যে ডান দিকে ঢুকে পড়ে। এক ব্লক এগিয়ে গিয়ে গাড়িটা ঘুরিয়ে নেবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সে আবিষ্কার করল রাস্তাটি বাম দিকে বাঁকা হয়ে ঘুরে যাচ্ছে। তারিক ভয় পেয়ে দেখল, রাস্তাটি শহরের সবচেয়ে ভয়ংকর এলাকার দিকে ঘুরে যাচ্ছে। রাস্তাঘাটে মানুষ বেশি নেই, গাড়িও খুব কম। দোকানপাট বন্ধ, দেয়ালে হিজিবিজি আঁকা। রাস্তার মোড়ে কিছু ভয়ংকরদর্শন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, তাদের দেখেই বোঝা যায় এই পৃথিবী থেকে তারা কিছু পায় নি, তাই পৃথিবীর কোনো

কিছুর জন্যে তাদের কোনো ভালবাসা নেই।

তারিক বুঝতে পারে সে খুব বড় একটা ভুল করে ফেলেছে। তাকে যেভাবেই হোক এখান থেকে বের হয়ে যেতে হবে— যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। সামনে না গিয়ে এখানেই গাড়িটা ঘুরিয়ে নিতে হবে। তারিক তাড়াতাড়ি জানালা তুলে দরজা বন্ধ করে দিল, প্রথমে নিজেরটা, তারপর সরকার স্যারেরটা।

ছোট একটা গলি দেখা গেল সামনে। গাড়ির মাথাটা অল্প ঢুকিয়ে মনে হয় ঘুরিয়ে নেয়া যাবে। পিছনে কোনো গাড়ি নেই দেখে নিশ্চিত হয়ে সে সাবধানে গাড়িটার মাথা গলিটিতে অল্প একটু ঢুকিয়েছে, সাথে সাথে প্রচণ্ড চিৎকার করে কে যেন গাড়ির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রথমে হ্যাঁচকা টান মেরে গাড়ির দরজা খুলতে চেষ্টা করে, না পেরে গাড়ির বনেটের উপর শুয়ে পড়ে গাড়ির কাঁচে আঘাত করতে থাকে। লোকটি বিশাল, গায়ের রং কালো এবং হাতে একটি বোতল। প্রচণ্ড চিৎকার করে সে হাতের বোতলটি দিয়ে গাড়ির কাঁচ ভেঙে ফেলার চেষ্টা করতে থাকে। তারিক গিয়ার পাল্টে গাড়িটাকে পিছিয়ে এনে লোকটাকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করে। লোকটি চিনে জোঁকের মতো ঝুলে থাকে গাড়িতে, গাড়িটা ঘুরছে বলে বোতল দিয়ে ঠিক করে আঘাত করতে পারছে না। তারিক গাড়ির বেগ বাড়িয়ে দেয়, দশ থেকে কুড়ি, কুড়ি থেকে ত্রিশ, তারপর হঠাৎ প্রাণপণে ব্রেক কষে। সাথে সাথে লোকটি গাড়ির বনেট থেকে গুলির মতো ছুটে বের হয়ে রাস্তায় আছড়ে পড়ে। নিউটনের প্রথম সূত্র অনুযায়ী তাই হওয়ার কথা।

প্রচণ্ড জোরে পড়েছে নিশ্চয়ই, লোকটি উঠতে পারছে না রাস্তা থেকে। পকেটে হাত দিচ্ছে, পিস্তল রিভলবার কিছু বের করবে নাকি? তারিক পাশ কাটিয়ে বের হয়ে গেল দ্রুত, পিছন থেকে কিছু চিৎকার হৈচৈ হল, এমনকি মনে হল গুলির শব্দও হল কয়েকটা। বড় রাস্তায় এসে তারিক প্রথম বার সহজভাবে নিঃশ্বাস নিল, সামনে দেখা যাচ্ছে সান্ডিয়াগো ফ্রী ওয়ে, সে উত্তরে যাবে, ডান দিকের রাস্তায়। আর যেন কোনো ভুল না হয়। ফ্রী ওয়েতে উঠে বড় একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, খুব বেঁচে গেলাম আজ।

সরকার স্যার হতভম্ব হয়ে বসে ছিলেন। প্রথম বার কথা বললেন এবারে, জিজ্ঞেস করলেন, তারিক বাবা, লোকটা কি ক্ষ্যাপা ছিল?

ক্ষ্যাপা না, ডাকাত। মাগিং করতে এসেছিল।

মাগিং? সেটা মানে কি?

হাইজ্যাকিং— ডাকাতি বলতে পারেন। গাড়ির কাঁচটা শক্ত ছিল বলে বেঁচে গেলাম। না হলে কী যে হত আজকে, ওহ্!

সরকার স্যার দুর্বল গলায় বললেন, কিন্তু আমি যে শুনেছি বিদেশের মানুষ অনেক ভালো, ঘরের দরজা খুলে রাখে, তবু কেউ ভিতরে ঢোকে না!

পৃথিবীর সব দেশের মানুষ একরকম স্যার। সব দেশে ভালো মানুষ আছে। সব দেশে চোর-বদমাইস আছে।

নিগ্রোগুলি খুব বদমাইস হয়, তাই না?

না না স্যার, এটা ঠিক না। এরা গরিব বলে চুরি-ডাকাতি এদের মাঝে বেশি। কিন্তু মানুষ তো একই। আলাদা করে খারাপ হবে কেমন করে? তা ছাড়া এদেরকে নিগ্রো বলতে হয় না।

কি বলতে হয়?

কালো।

কালো? শুনলে রাগ হবে না?

না।

তাজ্জবের ব্যাপার! সারা জীবন শুনে এসেছি কানাকে কানা বলিবে না, খোঁড়াকে খোঁড়া বলিবে না—

কানা খোঁড়া আর কালো তো এক জিনিস হল না। কানা খোঁড়া হচ্ছে এক ধরনের অক্ষমতা, কালো তো আর অক্ষমতা না। কালো হচ্ছে একটা রং। এদেশে কালোদের অবস্থা খুব খারাপ, কিন্তু সেটা তো অন্য ব্যাপার। ক্রীতদাস ছিল সবাই একসময়, বুঝতেইপারেন—

স্যার অনেকটা আপন মনে বললেন, কিন্তু আমি শুনেছিলাম এদেশের সব কিছু ভালো। সব কিছু ভালো।

ভুল শুনেছিলেন।

স্যার রাস্তায় বেশি কথা বললেন না। ইংগলউডের সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা স্যারকে খুব দমিয়ে দিয়েছে, প্রথম দিন এসেই এরকম একটা অভিজ্ঞতা হওয়ার পর খুব মনমরা হয়ে গেছেন। লস এঞ্জেলসের ফ্রী ওয়েতে ছয়টি পাশাপাশি লেন, অসংখ্য গাড়ি, ডাউনটাউনের উঁচু উঁচু দালান, ঝকঝকে আলোকোজ্জ্বল শহর— কোনো কিছু দেখেই স্যার আর কিছু বললেন না। অ্যাপার্টমেন্টে এসে স্যার বেশ খানিকক্ষণ পর একটু সহজ হলেন। তারিক ঘরবাড়ি পরিষ্কার করে গিয়েছিল, সবকিছু ঘুরেফিরে দেখলেন। বাথরুমে গিয়ে বললেন, শরীরটা কড়া হয়ে গেছে। একটা গোসল দিতে পারলে হত।

গোসল করেন।

এখন! এই রাত্রিবেলা? বুকে ঠাণ্ডা লেগে যাবে বাবা। বুড়ো হয়ে গেছি।

দিনে গোসল করলে যদি ঠাণ্ডা না লাগে, তা হলে রাতে গোসল করলে কেন ঠাণ্ডা লাগবে? আর আপনার হিসেবে এখন তো দিনই। এখানে যখন রাত, বাংলাদেশে তখন দিন না?

হেঃ হেঃ হেঃ, তা কথা ঠিকই বলেছিস। কিন্তু ঠাণ্ডা পানি দিয়ে—

ঠাণ্ডা পানি দিয়ে কেন গোসল করবেন?

তুই এখন আবার পানি জ্বাল দিয়ে গরম করে দিবি?

আমি কেন গরম করে দেব? ট্যাপ খুললেই তো গরম পানি!

শুনে সরকার স্যার চমৎকৃত হয়ে গেলেন। তারিক পানির ট্যাপ খুলে সরকার